প্রথম বর্ষ ॥ প্রথম সংখ্যা মে ১৯৬১

সম্পাদক সত্যজিৎ রায় ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু অঙ্কিত

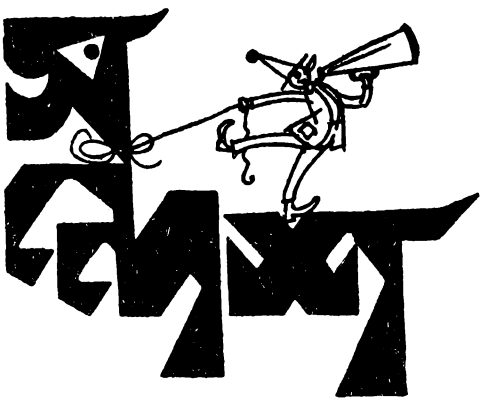

প্রথম বর্ষ । প্রথম সংখ্যা ● ছোটদের সচিত্র মাসিকপত্র ● বৈশাখ ১৩৬৮ । মে ১৯৬১

সন্দেশের কথা
পুরনো সন্দেশের ভূমিকা ১
পুণ্যলতা চক্রবর্তী ৩

লাল সুতো আর নীল সুতো
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৫

সত্যি
সুকুমার রায় ৮

চাঁদমামা
সুখলতা রাও ১০

দাদুর গল্প
অরুণনাথ চক্রবর্তী ১৪

দেশী-বিদেশী
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় ১৮, ২৬

রূপকথা
প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯

কত্তাবাবা
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২০

টং লিং
লীলা মজুমদার ২৩

পাপাঙ্গুল
সত্যজিৎ রায় ২৭

দধিসত্ত্ব মুনি
সুবিমল রায় ৩১

কোথা থেকে এল
জ্যোতিভূষণ চাকী ৩২

পিকলুর সেই ছোট্‌কা
গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩

জেনি মেমসাহেব নয়
সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৪০

মহাকাশে মানুষ
অমল দাশগুপ্ত ৪২

মজার খেলা
নলিনী দাস ৪৫

নতুন ধাঁধা ৪৮

বৈশাখ ১৩৬৮ ॥ মে ১৯৬১

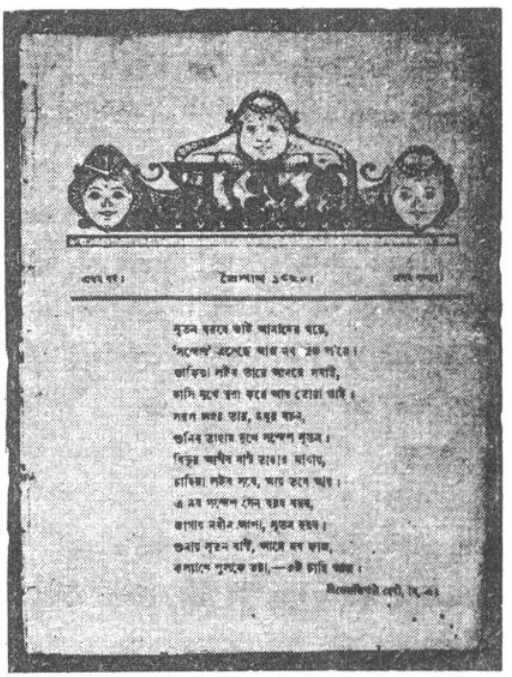

প্রথম 'সন্দেশ'-এর প্রথম পৃষ্ঠা

সন্দেশের কথা

১

একটি বাঙালীবাবু এলাহাবাদে ডাক্তারি করিতেন; তাঁহার একটি খোট্টা চাকর ছিল। চাকরটি সবে পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছে, শহরের চাল-চলন এখনও ভাল করিয়া শিখে নাই; আর বাঙালীর রীতিনীতি কিছুই জানে না।

বাবু তাহাকে বলিলেন, 'দেখ, দু-আনার সন্দেশ কিনিয়া আন তো।' চাকরটি দু-আনার পয়সা লইয়া সন্দেশ কিনিতে বাহির হইল, আর ভাবিল সে কী বিপদেই পড়িয়াছে। 'সন্দেশ' বলিলে তাহার দেশের লোকে বুঝে 'সংবাদ'; সে জিনিস যে আবার কী করিয়া পয়সা দিয়া কিনিতে পারা যায়, আর গেলেও তাহা যে কোথায় মিলে, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিল না। কাজেই বেচারা আর কী করে? সে পয়সা ক-টি হাতে লইয়া পথের পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। যে আসে তাহাকেই বিনয় করিয়া বলে, 'এ ভাইয়া! দো আনাকা সন্দেশ কাঁহা মিলি?'

এ কথা যে শোনে সেই হাসে। শেষে একজন তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, 'সন্দেশ বলিতে তুমি যাহা বুঝিয়াছ তাহা নয়; বাঙালীবাবুরা এক রকম লাড্ডু খায় তাহারই নাম "সন্দেশ"। ময়রার দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়।'

তখন সে ভারি খুশী হইয়া ময়রার দোকান হইতে সন্দেশ কিনিয়া আনিল, আর মনে করিল খুব একটা কাজ করিয়াছে।

চাকর বেচারা লাড্ডুকে খবর ভাবিয়া ভাবনায় পড়িয়াছিল। আমরাও যদি লাড্ডু বলিতে খবর বুঝিয়া লই, তাহাতে কাজের অসুবিধা হইতে পারে। কিন্তু খবরকে যদি লাড্ডু মনে করা যায় তবে সেটা বোধ হয় তেমন দোষের কথা হয় না।

লাড্ডু খাইবার জিনিস। সে জিনিস ভাল হইলে মিষ্টও লাগে বলও বাড়ে। ভাল বস্তু খাইয়া যেমন শরীরে বল হয়, তেমনি ভাল কথা জানিয়া মনে বল হয়; উহাই মনের আহার। তাহা যদি মিষ্ট হয়, তবে তাহাকে মনের লাড্ডু বলিতে দোষ কী?

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

জন্ম ২৮শে বৈশাখ, ১২৭০ ॥ মৃত্যু ৪ঠা পৌষ, ১৩২২

'সন্দেশ' বলিলেই যে আমরা সকলের আগে একটা খাইবার জিনিসের কথা ভাবি সে আমাদের অভ্যাসের দোষ। ঐ শব্দের আসল অর্থ যে 'সংবাদ' সংস্কৃত অভিধান খুলিয়া দেখিলেই এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। 'সংবাদে'র অর্থ বদলাইয়া 'মিঠাই' হওয়া খুবই আশ্চর্য, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু এরূপ ঘটনা একেবারে অসম্ভব নহে। আজকাল যেমন 'তত্ত্ব' পাঠান হয়, তেমনি আগে হয়ত লোকে 'সন্দেশ' পাঠাইত। তত্ত্ব, কিনা, কুশল মঙ্গলের সংবাদ, সেইটিই আসল কথা; সঙ্গের মিষ্টান্ন এবং উপহার স্নেহের চিহ্নমাত্র। কথা এই বটে, কিন্তু কাজে এখন দাঁড়াইয়াছে—কেবল মিঠাই সন্দেশ; আসল খবরের কথা চাপা পড়িয়াছে। সে খবর না থাকিলেও কেহ কিছু মনে করে না, কিন্তু মিঠাই না থাকিলে হয়ত চটে। 'সন্দেশে'র বেলায়ও বোধহয় এমনিতর একটা কিছু হইয়াছিল; আর 'তত্ত্বে'রও হয়ত কালে 'সন্দেশে'র দশা হইয়া উহা ময়রার দোকানে সের হিসাবে কিনিতে পাওয়া যাইবে।

যাহা হউক, আমরা যে সন্দেশ খাই, তাহার দুটি গুণ আছে। উহা খাইতে ভাল লাগে, আর উহাতে শরীরে বল হয়। আমাদের এই যে পত্রিকাখানি 'সন্দেশ' নাম লইয়া সকলের নিকট উপস্থিত হইতেছে, ইহাতেও যদি এই দুটি গুণ থাকে,—অর্থাৎ ইহা পড়িয়া যদি সকলের ভাল লাগে আর কিছু উপকার হয়, তবেই ইহার 'সন্দেশ' নাম সার্থক হইবে।

—সন্দেশের ভূমিকা ॥ বৈশাখ ১৩২০

সুকুমার রায়

জন্ম ১৩ই কার্তিক, ১২৯৪ ॥ মৃত্যু ২৪শে ভাদ্র, ১৩৩০

সন্দেশ! কত যত্ন ক'রে ক্ষীর-ছানা-চিনিতে পাক ক'রে, তার মধ্যে নানা উপাদান মিশিয়ে, নানা রকম ছাঁচে ফেলে, কত রকম সন্দেশই না তৈরি হয়! আবার, কত রকম তাদের নাম — 'মনোহরা', 'প্রাণহরা', 'দেলখোস্', 'মধুক্ষরা', 'অবাক্', 'আবার খাবো' — শুনলেই খেতে ইচ্ছা হয়, না? দেখতে যেমন লোভনীয়, খেতে তেমনি উপাদেয়, আবার তেমনি উপকারী আর পুষ্টিকর — সন্দেশ কে না ভালবাসে? তাই তো দোকানে নিত্য নতুন নামের নতুন নতুন রকমের সন্দেশ তৈরি হয়।

কিন্তু একবার যে এক আজব 'সন্দেশ' সৃষ্টি হয়েছিল — ক্ষীর নয়, ছানা নয়, পেস্তা-বাদাম-নারকল নয়—কাগজের তৈরি! সে-সন্দেশ দেখে যেমন চোখ জুড়োত, চেখে তেমনি আনন্দ ও তৃপ্তি হত — তার স্বাদ যারা পেয়েছিল, তারা আজও সে অপরূপ স্বাদ ভুলতে পারে নি।

সার্থক হয়েছিল সেই নাম! সেদিনকার ছেলেমেয়েদের কাছে — শুধু ছেলেমেয়ে কেন, বড়দের কাছেও, এই 'সন্দেশ' আসল সন্দেশের মতই লোভনীয় আর প্রিয় হয়েছিল। সন্দেশের জন্য সকলে পথ চেয়ে থাকত, সন্দেশ এলেই বাড়িতে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত। কত সুন্দর রঙিন ছবি, কত সুন্দর সুন্দর গল্প কাহিনী ও কবিতা, কত রকম আশ্চর্য খবর, কত জানবার কথা ও ভাববার কথা, আবার কত হাসির কথা, কী মজার মজার সব ছবি, নতুন রকম ধাঁধা, নতুন মজাদার খেলা — একবার হাতে পেলে কেউ আর ছাড়তে চাইত না!

এমন সুন্দর ক'রে সন্দেশ যাঁরা গড়েছিলেন, তাঁদের নাম তো তোমাদের কাছে অচেনা নয় — আমাদের দেশের শিশুসাহিত্যে তাঁদের নাম যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

প্রথম যাঁরা বাংলাদেশে ছোটদের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তাঁদের মধ্যে একজন অগ্রণী ছিলেন। নানাদিকে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল — যেমন লেখায়, তেমন ছবি আঁকায়, তেমনি গান-বাজনায় — তার উপরে ছোটদের মন ভোলাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর আশ্চর্য রকম! ছোট ছেলেমেয়েদের তিনি খুব ভালবাসতেন আর সর্বদা চিন্তা করতেন — কিসে তারা খুশী হয়, কিসে তাদের ভাল হয়।

তখন আমাদের দেশে ছোটদের জন্য কোন পত্রিকা ছিল না, ছোটদের মনের মত ভাল বইও

ছিল না। প্রায় সত্তর বছর আগে, ছোটদের জন্য প্রথম বাংলা পত্রিকা বেরিয়েছিল — 'সখা ও সাথী'। তার কিছুকাল পরেই এল 'মুকুল'। এই দুটি কাগজেরই প্রধান উদ্যোক্তা আর লেখকদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তখনকার দিনে আমাদের দেশে ভাল ছবি তৈরি কিংবা ছাপার কোন উপায় ছিল না, তাই তিনি স্থির করলেন যে আমাদের দেশেও ভাল ছবি তৈরি করতে ও ছাপাতে হবে। নিজের চেষ্টায় সব শিখে নিয়ে, তিনি আমাদের দেশে উঁচুদরের ছবি তৈরি করা ও ছাপানোর ব্যবস্থা করলেন।

ছোটদের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর বই তিনি লিখলেন — সে সব বইয়ের চমৎকার ছবিগুলিও সব তাঁর নিজের আঁকা — যেমন মিষ্টি, মজার ও সুন্দর লেখা, তেমনি সুন্দর ও মজার ছবি! ছোটদের ঠিক মনের মত, ভাল একখানি পত্রিকা করবার ইচ্ছা তাঁর মনে অনেকদিন থেকেই ছিল, এবার তিনি 'সন্দেশ' তৈরি ক'রে দেশের ছেলেমেয়েদের হাতে দিলেন। সে সন্দেশ পেয়ে ছেলেমহলে যেমন সাড়া পড়ে গেল, বড়রাও তেমনি আগ্রহ দেখালেন। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ ক'রে, অনেক বড় বড় লেখক সন্দেশে লেখা দিলেন। সন্দেশ শিশুসাহিত্যে এক নতুন যুগ এনে দিল, দিন দিন সন্দেশের আদর বেড়ে চলল।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর মৃত্যুর পরে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সুকুমার রায় যোগ্যতার সঙ্গে সন্দেশের ভার নিলেন। সন্দেশের পাতায় সুকুমার রায় যে নির্মল আনন্দ পরিবেশন করলেন, তার তুলনা নেই। আমাদের দেশে সে যেন এক আশ্চর্য নতুন জিনিস! তাঁর কবিতার ছন্দে লেখায়, ছবির রেখায় রেখায় যে হাসি ভরা থাকত, প্রাণখোলা সে হাসিতে মনের সব গ্লানি দূর হয়ে গিয়ে মন নির্মল তাজা হয়ে উঠত। কিন্তু হায়, সে হাসির উৎস হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল! অকালে অতি অল্প বয়সে তিনি এ পৃথিবী থেকে চলে গেলেন।

সুকুমার রায়ের পরে তাঁর ভাই সুবিনয় রায় সন্দেশের ভার নিলেন। তাঁরও ছোটদের জন্য সুন্দর ও মজার ক'রে লিখবার ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল, প্রাণপণ চেষ্টা আর ইচ্ছারও অভাব ছিল না, কিন্তু কঠিন অসুখে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল — এ ভার তিনি বেশী দিন বইতে পারলেন না।

কয়েক বৎসর ধ'রে ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে মুখভরা হাসি আর প্রাণভরা আনন্দ বিলিয়ে, আনন্দের মধ্যে দিয়েই তাদের শিক্ষা দিয়ে, তাদের বুদ্ধি ও জানবার ইচ্ছা ফুটিয়ে তুলে তারপর যেদিন সন্দেশ বন্ধ হয়ে গেল, সেদিন সকলের মনে কী দুঃখ! কোনো অতিপ্রিয় আপনার জনকে হারালে যেমন হয়। সেদিনের ছেলেমেয়েরা এখন বড় হয়েছেন, কিন্তু সন্দেশকে তাঁরা এখনও ভোলেন নি।

এতদিন পরে সন্দেশ আবার এসেছে — কত আশা আর আনন্দের সঙ্গে তাকে আদরে বরণ করছি। আবার সন্দেশ ঘরে ঘরে নির্মল হাসি ও আনন্দের ভাণ্ডার খুলে দিক, হাসি ও আনন্দের মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের জ্ঞান বুদ্ধি ফুটিয়ে তুলুক, তাদের মনের সুকুমার বৃত্তিগুলি বিকশিত ক'রে দিক।

—সন্দেশের নবজন্ম সার্থক হোক!

পুণ্যলতা চক্রবর্তী

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

এক জোলা একদিন তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'আমি পায়েস খাব, পায়েস রেঁধে দাও।' জোলার স্ত্রী বলিল, 'ঘরে কাঠ নেই ; কাঠ এনে দাও, পায়েস রেঁধে দিচ্ছি।' জোলা কাঠ আনিতে গেল।

পথের ধারে একটা বড় আম গাছ ছিল, তাহার একটা শুক্‌নো ডালের আগায় বসিয়া জোলা তাহারই গোড়ার দিকটা কাটিতেছে। তাহা দেখিয়া পথের লোক একজন ডাকিয়া বলিল, 'ওহে, ও ডাল কেটো না, কাটলে পড়ে যাবে।' জোলা বিরক্ত হইয়া বলিল, 'তুমি গুনতে জানো নাকি? ও ডাল কাটলে প'ড়ে যাব, তা তুমি কী ক'রে জানলে? আমি পায়েস খাব না বুঝি!' পথের লোক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। আর, খানিক পরে জোলাও ডালসুদ্ধ পড়িয়া গেল।

গাছ হইতে পড়িয়াই জোলা ভাবিল, 'তাই তো! আমি যে প'ড়ে যাব, তা ও জানলে কী ক'রে? ও নিশ্চয় একটা কেউ হবে।' এই ভাবিয়া জোলা ছুটিয়া গিয়া সেই পথিকের পা জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'প্রভু, আপনি কে? আমি কবে মরব, সেটি আমাকে ব'লে দিন।' পথিক ভারি মুশকিলেই পড়িল। জোলার খুব বিশ্বাস হইয়াছে যে, এ পথিক সামান্য পথিক নয় ; সুতরাং তাহার প্রশ্নের উত্তর না পাইলে তাহাকে কিছুতেই ছাড়িতেছে না। শেষটা পথিক যখন দেখিল যে, একটা কিছু না বলিলে তাহার আর ঘরে যাওয়া হইতেছে না, তখন সে রাগিয়া বলিল, 'তোর পেটের ভিতর থেকে লাল সুতো আর নীল সুতো যখন বেরুবে, তখন তুই মরবি।' এই কথায় জোলা সন্তুষ্ট হইয়া বাড়ি ফিরিল।

এখন হইতে জোলা ঠিক হইয়া বসিয়া আছে যে, লাল সূতা আর নীল সূতা বাহির হইলেই তাহার মৃত্যু। সুতরাং সে রোজ পরীক্ষা করিয়া দেখে, তাহা বাহির হইল কি না। এইরূপ পরীক্ষা করিতে গিয়া একদিন সত্য সত্যই তাহার কাপড়ে একখণ্ড লাল সূতা আর-একখণ্ড নীল সূতা পাইল। আর, অমনি সে চিৎকার করিয়া তাহার স্ত্রীকে বলিল, 'ওগো শীগগির এস, আমি মরে গিয়েছি — আমার লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছে।' তাহার স্ত্রী আসিয়া দেখিল, সত্য সত্যই লাল সূতা আর নীল সূতা। তখন সে বেচারা কী করে, জোলাকে বিছানায় শোয়াইয়া কাপড় চাপা দিয়া সে কাঁদিতে বসিল। এর মধ্যে আর দু-চারজন জোলা বেড়াইতে আসিয়া দেখে যে, জোলার স্ত্রী কাঁদিতেছে। তারপর জিজ্ঞাসা করিয়া যখন জানিল যে, লাল সূতা নীল সূতা পাওয়া গিয়াছে,

তখন সকলে স্থির করিল যে, জোলা নিশ্চয় মরিয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার সৎকারের চেষ্টা দেখিতে লাগিল।

কিন্তু ইহার মধ্যে ভারি মুশকিল দেখা দিল। পোড়ানোতে জোলা কিছুতেই রাজী নয়। পোড়ানোর কথা তুলিতেই সে বলে, 'ওমা! পুড়ে যাব যে!' মরিয়া গেলে তাহাকে পোড়ানো ছাড়া আর কী করা যায়?—গোর দেওয়া! কিন্তু জোলা তাহাতেও অসম্মত! বলে, 'ওমা! দম আট্‌কে যাবে যে!' শেষে অনেক যুক্তির পর স্থির হইল যে, জোলাকে গোর দেওয়াই হইবে, কিন্তু মুখখানা জাগাইয়া রাখা যাইবে। জোলা তাহাতে রাজী হইল; কিন্তু সে বলিল যে, 'খিদে পেলে চারটি ভাত দিয়ো।' এইরূপ পরামর্শের পর জোলাকে গোর দেওয়া হইল — অর্থাৎ তাহার মুখ জাগিয়া রহিল, আর সব মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিল।

এইরূপে সমস্ত দিন চলিয়া গেল। রাত্রিতে চারটি ভাত খাইয়া জোলা একটু নিদ্রার চেষ্টা দেখিল।

সেই রাত্রিতে সাত চোর রাজার বাড়িতে চুরি করিতে চলিয়াছে। চোরেরা তো আর বাবুদের মতন সদর রাস্তা দিয়া চলে না—তাহারা প্রায়ই ঝোপজঙ্গলের ভিতর দিয়া চলে, আর সেসব জায়গা অনেক সময়ই নোংরা থাকে। চলিতে চলিতে একজন চোর কাদার মতন একটা কী জিনিস মাড়াইল, সে জিনিসটার বিশ্রী গন্ধ! সে পা মুছিবার জন্য একটা জায়গা খুঁজিতে লাগিল। উহার নিকটেই জোলাকে গোর দিয়াছে, সে চোর পা মুছিবি তো মোছ, সেই জোলার মুখে গিয়া মুছিতে লাগিল! ঘষার আর গন্ধের চোটে জোলার ঘুম ভাঙিয়া গেল; সে রাগিয়া বলিল, 'উঁঃ—হুঁঃ—হুঁঃ—! তোমার কি চোখ নাই না কি?'

চোর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই কে রে?'

জোলা বলিল, 'আমি জোলা।'

'এখানে কী করছিস?'

'আমি যে ম'রে গিয়েছি; আমার লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছে তাই আমাকে গোর দিয়েছে!'

এই কথা শুনিয়া চোরেরা খুব হাসিতে লাগিল। তারপর তাহাদের একজন বলিল, 'একে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল।'

চোরেরা জোলাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহার মৃত্যু হয় নাই, আর তাহাদের সঙ্গে গেলে পেট ভরিয়া খাইতে পারিবে। জোলা জিজ্ঞাসা করিল, 'কী খাওয়াবে? পায়েস?' চোরেরা বলিল, 'হাঁ পায়েস — চল্!' পায়েসের কথা শুনিয়া জোলা কোন আপত্তি করিল না। চোরেরা তাহাকে উঠাইয়া লইয়া চলিল।

রাজার বাড়িতে গিয়া চোরেরা রাজার ঘরে প্রকাণ্ড সিঁদ কাটিল। তারপর জোলাকে ঐ সিঁদের ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া বলিল, 'রাজার মাথার মুকুটটা নিয়ে আয়।' রাজার খাটে মশারি খাটানো ছিল, তাহা দেখিয়া জোলা ভারি আশ্চর্য হইয়া গেল। সে মশারির চারিদিক ঘুরিয়া কোথাও

তাহার দরজা দেখিতে পাইল না ; সুতরাং চোরেদের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'হল না ; ওর ভিতরে আর একটা ঘর আছে, তার দরজা নেই।'

চোরেরা বলিল, 'দূর বোকা! ওটা ঘর নয়, মশারি। ওটাকে তুলে দেখলি না কেন?' জোলা আবার ঘরের ভিতরে গেল।

এবার জোলা মশারি তুলিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু সেটাকে নাড়িতেও পারিল না—কারণ সে খাটসুদ্ধ ধরিয়া টানাটানি করিয়াছিল। সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, 'না ভাই, ওটা বড্ড ভারী।'

'আরে, এমন গাধাও আর দেখি নি! তুই বুঝি খাটসুদ্ধ তুলতে গিয়েছিলি? শুধু ওর কাপড়টা টানতে হয়।'

এবারে জোলা আর কোন ভুল করিল না। মশারির কাপড় ধরিয়া টানিতেই সেটা উঠিয়া আসিল। ভিতরে খুব উঁচু গদির উপরে রাজা শুইয়া আছেন, তাঁহার গায় ঝালর-দেওয়া অতিশয় পুরু লেপ। দেখিয়া জোলার মনে ভারি দুঃখ হইল। সে ভাবিল, বুঝি রাজাকে গোর দিয়াছে! তারপর দেখিল, মুখখানি জাগিতেছে! তখন সে ভাবিল যে, 'ঠিক তো আমারই মতন করেছে দেখছি! এরও লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছিল নাকি?' জোলা যত ভাবে, ততই আশ্চর্য হয়, আর ততই তাহার জানিতে ইচ্ছা করে, রাজা মহাশয়েরও লাল সূতা নীল সূতা বাহির হইয়াছিল কি না। শেষটা এমন হইল যে, এই খবরটা তাহার না জানিলেই নয়। সুতরাং সে রাজাকে ঠেলিয়া জাগাইল। আর, তিনি চোখ মেলিবা মাত্রই, জিজ্ঞাসা করিল : 'লাল সুতো নীল সুতো বেরিয়েছিল?'

ইহার পর একটা মস্ত গোলমাল হইল। রাজবাড়ির সকলে জাগিয়া গেল, সাত চোর ধরা পড়িল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে জোলাও ধরা পড়িল।

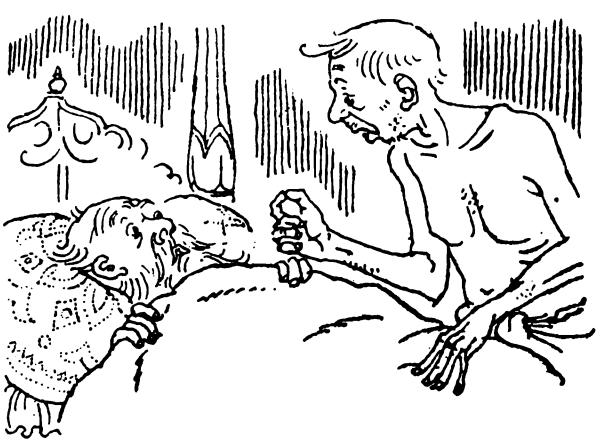

পরদিন বিচার। জোলা আগাগোড়া সকল কথা খুলিয়া বলিল। লাল সুতো নীল সুতোর কথা, গোর দিবার কথা, চোরের পা মুছিবার কথা, পায়েসের কথা —কিছুই বাকি রাখিল না।

বিচারে সাত চোরের উচিত সাজা হইল। আর জোলাকে পেট ভরিয়া উত্তম উত্তম পায়েস খাওয়াইয়া বিদায় দেওয়া হইল।

—পুরনো সন্দেশ থেকে

সত্যি

ছবি ও লেখা ॥ সুকুমার রায়

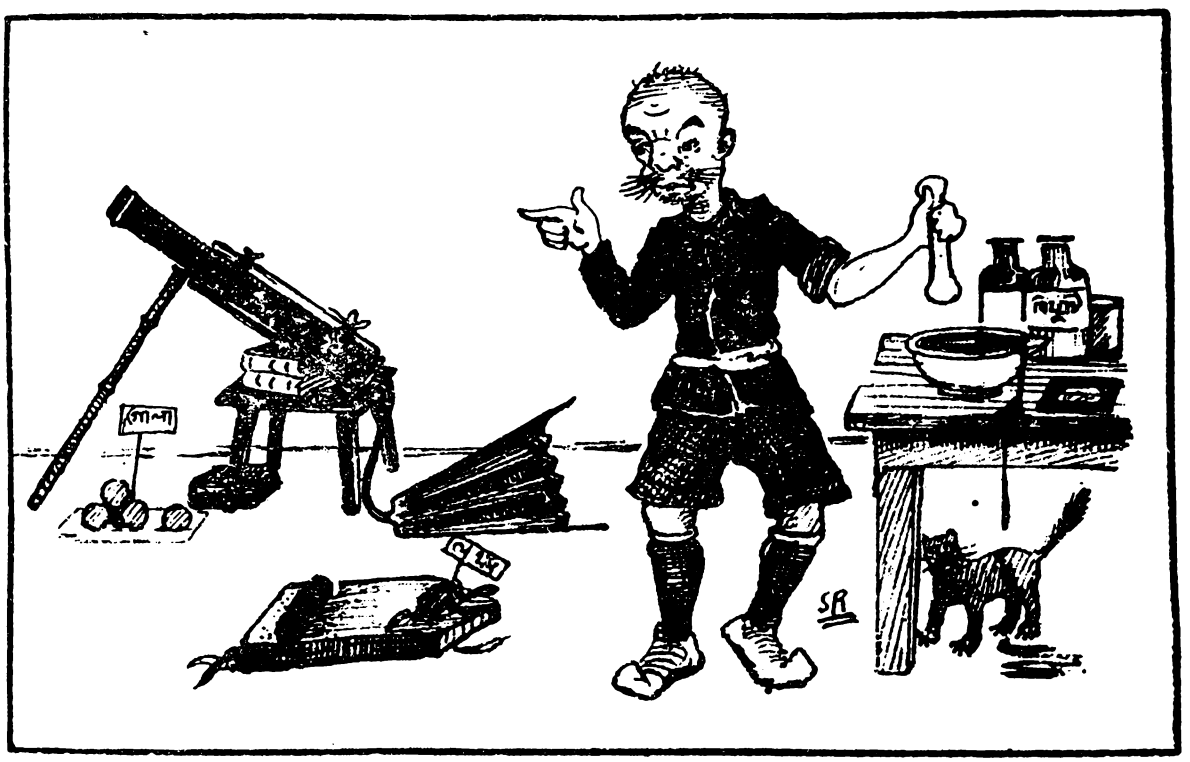

ইনি কে জানো না বুঝি? ইনি নিধিরাম পাটকেল।

কোন্ নিধিরাম? যার মিঠায়ের দোকান আছে?

আরে দূৎ! তা কেন? নিধিরাম ময়রা নয় — প্র-ফে-সার্ নিধিরাম!

ইনি কী করেন?

কী করেন আবার কী? আবিষ্কার করেন।

ও বুঝেছি! ঐ যে উত্তরমেরুতে যায় — যেখানে ভয়ানক ঠাণ্ডা — মানুষজন সব মরে যায় —

দূর মুখ্যু! আবিষ্কার বললেই বুঝি উত্তরমেরু বুঝতে হবে, বা দেশবিদেশে ঘুরতে হবে? তাছাড়া বুঝি আবিষ্কার হয় না?

ও! তাহলে?

মানে, বিজ্ঞান শিখে নানা রকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া করে নতুন নতুন কথা শিখছেন, নতুন নতুন

জিনিস বানাচ্ছেন। ইনি আজ পর্যন্ত কত কী আবিষ্কার করেছেন তোমরা তার খবর রাখ কি? ওঁর তৈরি সেই গন্ধবিকট তেলের কথা শোন নি? সেই তেলের আশ্চর্য গুণ। আমি নিজে মাখি নি বা খাই নি, কিন্তু আমাদের বাড়িওয়ালার কে যেন বলেছেন যে সে ভয়ঙ্কর তেল। সে তেল খেলে পরে পিলের ওষুধ, মাখলে পরে ঘায়ের মলম, আর গোঁফে লাগালে — দেড় দিনে আধহাত লম্বা গোঁফ বেরোয়।

সে কী মশাই! তাও কি হয়?

আলবাৎ হয়! বললে বিশ্বাস করবে না, কিন্তু নন্দলাল ডাক্তার বলেছে ভুলু মিত্তিরের খোকাকে ওই তেল মাখিয়ে তার এয়া মোটা গোঁফ হয়ে গেছিল।

কী আবোল তাবোল বকছেন মশাই।

বিশ্বেস করতে না চাও তো বিশ্বেস কোরো না, কিন্তু চোখে যা দেখছ তা বিশ্বেস করবে তো? কী কাণ্ড হচ্ছে দেখছ তো? ঐ দেখো নিধিরাম পাটকেলের নতুন কামান তৈরি হচ্ছে। নতুন কামান, নতুন গোলা, নতুন সব। এ কি সহজ কথা ভেবেছ? ওই রকম আর গোটা পঞ্চাশ কামান আর হাজার দশেক গোলা তৈরি হলেই উনি লড়াই করতে বেরুবেন।

সব নতুন রকম হচ্ছে বুঝি?

নতুন না তো কী? নতুন অথচ শস্তা। ওই দেখো কামান আর ওই দেখো গোলা। কামানে কী আছে? নল আছে আর বাতাস-ভরা হাপর আছে। নলের মধ্যে গোলা ভ'রে খুব খানিক দম নিয়ে ভ—শ্ ক'রে যেমনি হাপর চেপে ধরবে অমনি হুশ্ ক'রে গোলা গিয়ে ছিটকে পড়বে আর ফট্ করে ফেটে যাবে।

তার পরে?

তার পরেই তো হচ্ছে আসল মজা। গোলার মধ্যে কী আছে জান? বিছুটির আরক আছে, লঙ্কার ধোঁয়া আছে, ছারপোকার আতর আছে, গাঁদালের রস আছে, পচামুলোর একস্ট্রাক্ট আছে, আরও যে কত কী আছে, তার নামও আমি জানি না। যত রকম উৎকট বিশ্রী গন্ধ আছে, যত রকম ঝাঁঝালো তেজাল বিটকেল জিনিস আছে, আশ্চর্য বৈজ্ঞানিক কৌশলে সব তিনি মিশিয়েছেন ঐ গোলার মধ্যে। সেদিন ছোট একটা গোলা ওঁর হাত থেকে প'ড়ে ফেটে গিয়েছিল শুনেছ তো?

তাই নাকি? তারপর হল কী?

যেমনি গোলা ফাটল অমনি তিনি চট ক'রে একটা ধামা চাপা দিয়েছিলেন নইলে কী হত কে জানে। তবু দেখছ ওষুধের গন্ধে আর ঝাঁঝে প্রফেসারের চেহারা কেমন হয়ে গেছে। তার আগে ওঁর চেহারা ছিল ঠিক কার্তিকের মত; মাথাভরা কোঁকড়া চুল আর একহাত লম্বা দাড়ি! সত্যি!

সত্যি নাকি?

সত্যি না তো কী?

সুখলতা রাও

খুকু

দাদা ওই যে শাদা জোছ্না-মাখা মেঘের ফাঁকে
ওই যাচ্ছে দেখা থালার মত চাঁদমামাকে
বলো ওইখানে কি সত্যি ক'রে মানুষ থাকে ॥

দাদা

না রে চাঁদের গায়ে জন্তু মানুষ কিচ্ছু নাই
তবে চাঁদবুড়িও সত্যি কিনা ভাবছি তাই
ভারি ইচ্ছে করে নিজের চোখে দেখতে তাই
জানিস জন্মদিনের আমার টাকা হারাই পাছে
তাই মা রেখেছে যত্ন ক'রে নিজের কাছে
বুঝি একশো টাকা আলমারিতে বন্ধ আছে
আমি তাই না দিয়ে, সাহেবরা যে করছে রকেট্
চাঁদে পৌঁছে যায় যে উড়োজাহাজ কিংবা জেট্
সেই জাহাজখানা চড়ব ব'লে কিনব টিকেট ॥

খুকু

দাদা বাবা কিন্তু করবে মানা নিশ্চয়ই
মাও বলবে 'খোকা, ছাড়ব না তো কক্ষনই
দাও আমার হাতে, কোথায় তোমার টিকেট কই
শোনো সাহেবদের সে চাঁদের জাহাজ উড়বে কবে
যদি ফসকে সেটা হঠাৎ নিচে খসবে তবে
ভাবো কী ভয়ানক মুশকিলেতে পড়তে হবে ॥

(রাত্রে খোকার স্বপ্ন)

চাঁদবুড়ি

ওগো খোকাবাবু আছ বিছানাতে

খোকা

কে রে কথা বলে ডাকে এত রাতে

বুড়ি

আমি চাঁদবুড়ি চাঁদেতেই থাকি
তুমি যাবে শুনে এনু তাড়াতাড়ি

খোকা

ওমা তাই নাকি তুমি চাঁদবুড়ি
চাঁদ থেকে নেমে এসে গুড়িগুড়ি
বলো বলো দেখি কেমন সে দেশ
পথ কোন ধারে যাব কিনা বেশ ॥

বুড়ি

সেই দেশেতে জ্যোৎস্না-আলো বেজায় চড়া ভাই
গাছের ছায়া নেই সেখানে মেঘের ছায়া নাই
এক ফোঁটাও মিলবে না জল যতই তেষ্টা পাক
করছে খাঁ খাঁ নিঝুম সে ঠাঁই, মরুর মত খাক্
মস্ত উঁচু পাহাড় জাগে আকাশটাকে রুখে
কোন্ সেকালে আগুন ছিল সেই পাহাড়ের বুকে
কখন কবে জুড়িয়ে এল ঠাণ্ডা হল শেষে
হাড়কাঁপুনি লাগবে গেলে বরফ-হিম দেশে
মন যদি চায় ছুটতে সেথা এই সবেরও পরে
রইল তোমার নেমন্তন্ন আমাদের সে ঘরে ॥

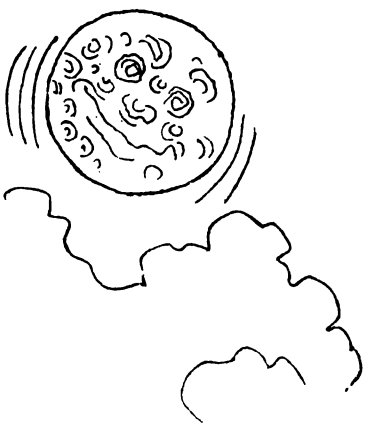

খোকা

হোক ঠাণ্ডা সে হোক মরুভূমি
মানুষেরা যাবে দেখে নিও তুমি
দরকারী যা বা সাথে নিয়ে যাবে
ঘরবাড়ি সেথা কোথা বলো পাবে
কাঁচ দিয়ে নেবে ক'রে ঘর দোর
কত কেরামতি কত তোড়জোড়
শূন্যের গায়ে রবে ইস্টিশান
এই হল ব'লে চাঁদ-ব্যোমযান ॥

খুকু

তুমি আমি মনে কর
হয়ে গেছি খুব বড়
সেই প্লেন চড়লাম
এই উড়ে চললাম

এইবার মেঘ ডাকে
বিদ্যুৎ চমকায়
বাজ বুঝি প্লেনটাকে
গুড় গুড় ধমকায়

খোকা

ওই দেখ্ ছুটে চলে
ঝক্ ঝক্ ঝক্ জ্বলে
এক দুই তিন চার
আকাশটা হল পার

উড়ন্ত থালা নাকি
কোন্‌খান থেকে এল
মঙ্গলবাসীরা কি
আমাদের দেখে গেল

চাঁদ ভরা মস্ত
গোল গোল গর্ত
পাহাড়ে প্রকাণ্ড
কী বিরাট কাণ্ড

ওই ফের উল্কা
ধাঁ — ক'রে পড়ল
প্রাণ তার পল্‌কা
পৃথিবীতে খস্‌ল

নীলে-নীল শূন্য
সবখানে পূর্ণ
নেই তার নিশানা
রাস্তার ঠিকানা॥

খুকু

চাঁদমামা জ্বলছে
আলো ঝরে পড়ছে
ঠিক যেন হাসছে
ভালবেসে ডাকছে॥

খোকা

এইবার হই পার
বাধা কিছু নেই আর
চলি সামনের পানে
দুইজন খুশিপ্রাণে

ব্যোমযান সাঁই সাঁই
উড়ছে তো উড়ছেই
চাঁদ দেখে বাঁই বাঁই
ছুটছে তো ছুটছেই॥

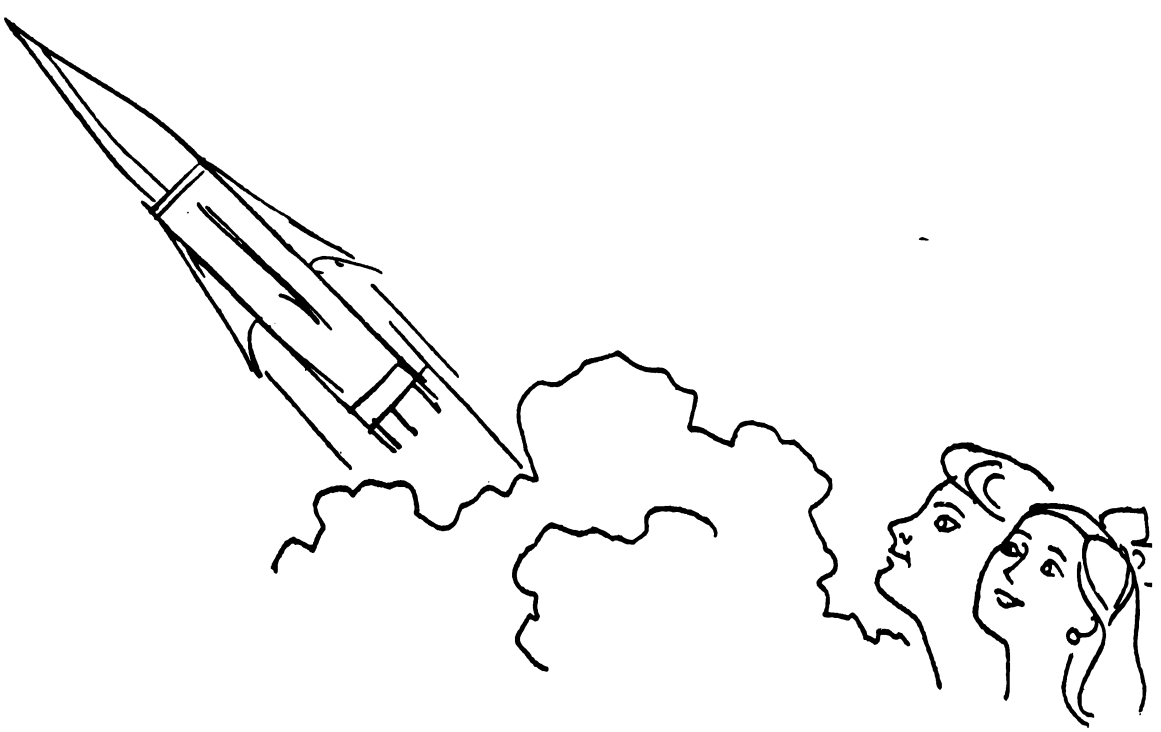

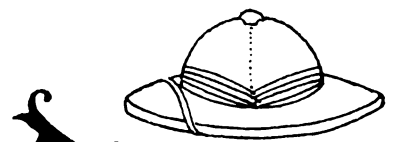

দাদুর গল্প

* * * * * * * * * * অরুণনাথ চক্রবর্তী * * * * * * * * * * *

কু-ঝুক্ঝুক্!

'কু-উ-ঝুক্-ঝুক্-ঝুক্' — কানফাটা চিৎকারে হুইস্‌ল্ ছেড়ে, কাঁচঘেরা লম্বা বারান্দায় আমি রেলগাড়ি চালাচ্ছি — ছেলেবেলার এই দৃশ্যটা আমার মনে বেশ স্পষ্ট হয়ে রয়েছে। নিজেই এঞ্জিন, নিজেই ড্রাইভার ও গার্ড, আবার নিজেই যাত্রী — রোজ কত রাজ্যই যে ঘুরে আসতাম মনে মনে! রেলগাড়ি চড়ে বেড়াবার শখটা প্রায় সব ছেলেমেয়েরই বোধহয় থাকে, আমার তো যেন একেবারে নেশার মত ছিল — একলা আপন মনে সারাদিন রেলগাড়ি-রেলগাড়ি খেলতাম ; তাই আমার ডাকনাম হয়েছিল 'কুঝুক্ঝুক্'।

এই ঘুরে বেড়াবার শখটা আমার ভাল করেই মিটেছিল --- বলতে গেলে সারাজীবনটা আমার ঘুরে ঘুরেই কেটেছে। কিছু একটা আশ্চর্য অ্যাড্‌ভেঞ্চারপূর্ণ ভবঘুরে জীবন নয়, সরকারী কাজে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ানো, তবে তার মধ্যেই বেশ রকমারি ছিল ; অনেক মজা ছিল। এখন বুড়ো হয়েছি, আর ঘুরতে পারি না। বসে বসে সেসব পুরনো কথা ভাবতে খুব ভাল লাগে। সেই পুরনো দিনের গল্পই কিছু তোমাদের বলব — হয়তো তোমাদেরও ভাল লাগবে।

জন্ম হয়েছিল আমার দার্জিলিঙে ; তারপর সেখান থেকে বাবা নানা জায়গায় বদলী হলেন ; আমরাও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলাম।

সে কি আজকের কথা? কটক যখন বদলী হয়েছিলাম তখন ওদিকে রেল-লাইনই হয় নি — আমরা কত ঘুরে গিয়েছিলাম জান? কলকাতা থেকে জাহাজে চড়ে, গঙ্গার মুখ দিয়ে বেরিয়ে, বঙ্গোপসাগর দিয়ে গিয়ে উড়িষ্যার ব্রাহ্মণী নদীর মুখে ঢুকলাম ; ব্রাহ্মণী নদী থেকে বৈতরণী নদী দিয়ে চাঁদবালিতে পৌঁছে, সেখানে সমুদ্রগামী জাহাজ ছেড়ে ছোট কেনাল-স্টীমারে চড়লাম ; কেনাল দিয়ে গিয়ে, বিরূপা নদী হয়ে মহানদীতে পড়লাম ; মহানদীর তীরে কটক — উত্তরে মহানদী, দক্ষিণে কাঠজুড়ি নদী, মাঝখানে শহরটি।

কটক থেকে পুরী আজকাল ট্রেনে যেতে তিন ঘণ্টাও লাগে না, গরুর গাড়িতে চড়ে কটক থেকে পুরী যেতে আমাদের তিনদিন লেগেছিল!

চট্টগ্রাম যখন গিয়েছিলাম, তখন বড় হয়েছি, কলেজে পড়ি। কর্ণফুলী নদীর তীরে, ছোট ছোট পাহাড়ে ভরা সুন্দর শহরটি। একেকটি 'টিলা'র (ছোট পাহাড়) উপরে একেকটি বাড়ি, নিচেও অনেক বাড়ি আছে। আমাদের বাংলোটি ছিল অমনি একটা টিলার উপরে।

একদিন কী কাণ্ড হল, সেই টিলার গায়ের জঙ্গলে কেমন করে যেন আগুন গেল লেগে, আর দেখতে দেখতে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে, চারদিক থেকে বেড়া-আগুনে আমাদের ঘিরে ফেলল! টিলার উপরে জল নেই, চারদিকে আগুন — আমরাও নিচে নামতে পারছি না, আমাদের বিপদ দেখে নিচে থেকে লোকজন ছুটে এসে, জল টেনে এনে আগুন নিবিয়ে আমাদের বাঁচাল।

আবার আরেকদিন গভীর রাত্রে সে কী ভীষণ সাইক্লোন! প্রচণ্ড ঝড়ে আমাদের বাংলোর টিনের চাল উড়িয়ে নিয়ে গেল; এই দুর্যোগের মধ্যে কে কার সাহায্য করতে ঘরের বার হবে? আমরা খাটের তলায় ঢুকে কোনমতে রাতটা কাটালাম, সকাল হতেই নিচে নেমে এলাম। বাড়িওয়ালা পাহাড়ের নিচে তাঁর আরেকটা বাড়ি আমাদের জন্য খালি করে দিলেন।

চট্টগ্রাম শহর থেকে নদী দিয়ে গেলে সমুদ্র প্রায় কুড়ি মাইল দূর হয়, আর মাঠঘাটের উপর দিয়ে 'শর্টকাট' করে গেলে, সাত মাইল। একবার আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে শর্টকাট দিয়ে হেঁটে সমুদ্র দেখতে গেলাম। তখন ভাঁটার সময়, সমুদ্র বেশ স্থির, জল অনেক দূর সরে গিয়েছে — মনের আনন্দে হাঁটুজল ভেঙে আমরা বহুদূর চলে গেলাম। আমরা বেশ জলের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে খেলা করছি, আর কোনো দিকে দৃষ্টি নেই, হঠাৎ খেয়াল হল — কলকল করে জল বেড়ে উঠছে, তীরের দিকে ঢেউ ছুটেছে — জোয়ার এসে পড়েছে! তখন ছুট্ — ছুট্ — ছুট্! ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটা কি সোজা কথা? দেখতে দেখতে হাঁটুজল থেকে কোমরজল হল, কোমর-জল থেকে বুকজল হল — এবার ভাসিয়ে নেয় আর কি! প্রাণের ভয়ে একটা শেষ চেষ্টা করে তীরের বালিতে এসে আছড়িয়ে পড়লাম, দম নিয়ে সুস্থ হতে হতে অনেকক্ষণ সময় লাগল।

এমনি আরো নানা জায়গায় ঘুরে, নানা স্কুল-কলেজে পড়ে, তারপর কলকাতায় এসে আমি পড়াশোনা শেষ করলাম। পাস করে বেরিয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ পেলাম। তখন থেকে আসল ঘোরাঘুরি শুরু হল।

ভাল্লুক ভায়া

চাকরি আরম্ভ হল রাঁচি থেকে। আমি যখন প্রথম রাঁচি গিয়েছিলাম তখনও রাঁচিতে রেল-লাইন হয় নি — পুরুলিয়া থেকে পুশপুশ গাড়িতে রাঁচি যেতে দেড় দিন লাগল। রাঁচি জেলায় 'সেট্‌লমেণ্ট' হচ্ছে — সমস্ত জমি জরিপ করে মেপে, সীমানা ঠিক করে, কোন্ জমির মালিক

কে, খাজনা কত, ইত্যাদি সব হিসাব করে লেখা হচ্ছে — সেই কাজ পরিদর্শন করবার জন্য সারা জেলার থানায় থানায় গ্রামে গ্রামে ঘুরে 'টুর্' করতে হবে।

যথাসম্ভব হাল্কা মালপত্র নিয়ে রওনা হলাম — সঙ্গে চলল সাহামৎ চাপরাশি, জোসেফ্ বেয়ারা, আর কাঁধের উপর 'শিকা-বাঙ্গি'তে মালপত্র নিয়ে একজন 'ভারিয়া'। আমি সাইকেল চড়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আর ওরা পাথর ডিঙিয়ে জঙ্গল ভেঙে শর্টকাট করে চলে যাচ্ছে — কাজেই, অনেক সময় দলছাড়া হয়ে পড়ছি।

কোথাও পাকা রাস্তা, কোথাও কাঁচা রাস্তা, আবার কোথাও মাঠের উপর দিয়ে, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে, সামান্য পায়ে-চলা পথ। চারদিকে পাহাড়, ঝরনা, জঙ্গল; আবার খেলার মাঠ, শস্যক্ষেত, তার মাঝে মাঝে গ্রাম; গ্রামের লোক অধিকাংশই ওরাঁও, হো ইত্যাদি আদিবাসী — ভারি সরল ফূর্তিবাজ মানুষ তারা, কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে নাচ-গান করে দিন কাটিয়ে দেয়। সারাদিন বাইরে ঘুরে কাজ করি, ডাকবাংলোয় কিংবা তাঁবুতে থাকি। কত সময় রাত্রে বাঘের ডাক শুনতে পাই; মাঝে মাঝে দেখতে পাই বাঘে মানুষ মেরেছে — থানায় তার মৃতদেহ নিয়ে এল; ভাল্লুকের উৎপাত তো লেগেই আছে!

কোচেডেগা ডাকবাংলোর সামনে একসারি পেঁপেগাছ, তাতে ছোটবড় অসংখ্য পেঁপে ফলেছে। চাঁদনী রাতে ঘরের মধ্যে বসে বন্ধ জানালার সার্সির ভিতর দিয়ে ভারি মজার তামাশা দেখতাম—এক ভালুক-ভায়া সপরিবারে পেঁপে খেতে আসত! মস্ত ভাল্লুকটা দু পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দুই পায়ে গাছ ধরে ঝাঁকাত, আর টুপটাপ করে পাকা পেঁপে খসে পড়ত। সবাই মিলে পেট ভরে খেয়ে নিয়ে, মা ভাল্লুকটা মাটিতে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ত আর ছানাগুলো তার গায়ের উপর দিয়ে লাফিয়ে গড়িয়ে, কুকুরছানার মত কিলবিল করে খেলা করত — তার পর আবার তারা ধীরেসুস্থে হেলতে দুলতে সার বেঁধে বাড়ি চলে যেত!

চারদিকের দৃশ্য ভারি সুন্দর — কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের উপর দিয়ে বড় বড় নদী হুড়হুড় ক'রে নেমে চমৎকার সব 'জলপ্রপাত' সৃষ্টি করেছে। এদেশে জলপ্রপাতকে বলে 'ঘাগ' — যেমন সুবর্ণরেখা নদীর 'হুড্রু ঘাগ', কোয়েল নদীর 'পেরোয়া ঘাগ', কাঁচি নদীর 'দশম্ ঘাগ'। আবার কোথাও গভীর বন — বিরাট বিরাট সব বনস্পতি মাথার উপরে ঘন ডালপালা মেলেছে, দিনের বেলাতেও সেখানে অন্ধকার।

এই রকম একটা বনের ভেতর দিয়ে একবার চলেছি, রাস্তার মধ্যে একটা পাহাড়ি নালা — এপারে রাস্তা ঢালু হয়ে নালার মধ্যে নেমে গিয়েছে, আবার ওপারে খাড়া হয়ে উঠেছে। ঢালু পথে গড়গড় ক'রে নামছি, নিচের দিকে চেয়ে দেখি — ওরে বাবা! নালার মধ্যে তিনটে ভাল্লুক! ঢালুর মুখে তো আর থামা যায় না, কপাল ঠুকে জোরে 'বেল' বাজাতে বাজাতে নেমে চললাম। ওপারে আবার চড়াই পথ — নেমে, দুহাতে সাইকেল ঠেলতে ঠেলতে হেঁটে উঠতে হবে — কী সর্বনাশ! ভাল্লুকও দেখি সেই পথে চলল! কিন্তু হঠাৎ আমার দিকে ফিরে তাকিয়েই, কী মনে করল জানি না — একেবারে হুড়মুড় ক'রে জঙ্গলের ভেতরে পালিয়ে গেল। বোধহয় ভাবল যে —

'হ্যাট্ কোট চশমাধারী
চ'ড়ে দুই চাকার গাড়ি
কিড়িং কিড়িং ডাক ছাড়ি
কে রে এটা, দেয় পাড়ি?
চেহারাটা কিম্ভূত ভারি—
সরে পড়ি তাড়াতাড়ি!'

বাঘ! বাঘ!!

একবার গয়া জেলার শেরেঘাটি থানায় একটা তদন্তে গিয়েছিলাম। 'শের' মানে বাঘ, সুতরাং বুঝতেই পারছ জায়গাটা বাঘের আড্ডা।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পরে রওনা হওয়া গেল। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড়ের গা ঘেঁষে সরু রাস্তা দিয়ে চলেছি; সামনে দুজন বন্দুকধারী কনস্টেবল, তারপর সারি সারি তিনখানা ডুলি — প্রথমটায় আমি, দ্বিতীয়টায় পুলিশ ইন্সপেক্টর, শেষেরটায় সাব-ইন্সপেক্টর — আরো কয়েকজন চৌকিদার আর গ্রামের লোক পিছনে রয়েছে। ডুলি-বেহারারা তাদের গানের তালে তালে পা ফেলে চলেছে, গ্রামবাসীরাও হাকিম আর পুলিশকে সমীহ ক'রে একটু নিচু গলায় গল্প করতে করতে চলেছে।

পথে এক জায়গায় খুব গভীর বন — দিনের বেলাতেও অন্ধকার। এখানে নাকি দিন-দুপুরে

বাঘ বেরোয়! বেহারাদের গান থেমে গিয়েছে, লোকজনদের মুখেও কথাটি নেই, সবাই ভয়ে ভয়ে একটি ওদিক তাকাতে তাকাতে সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে — চারদিকে একটা নিস্তব্ধ থমথমে ভাব।

হঠাৎ সেই নিস্তব্ধতা ভেদ ক'রে পিছন দিক থেকে একটা গম্ভীর চাপা গর্জন শোনা গেল —

'গ-র্-র্-র্ —ঘঁ!'

সকলে চম্‌কিয়ে থেমে গেল!

'গ র্-র্-র্ —ঘ্যাঁও!'

কনস্টেবল দুজন বন্দুক নিয়ে পিছনে যেদিক থেকে আওয়াজটা আসছিল সেই দিকে এগিয়ে গেল; আমরাও যে যার পিস্তল বাগিয়ে ধ'রে খাড়া বসলাম।

দু-চার মিনিটের মধ্যে কনস্টেবলরা ফিরে এল — উত্তেজনায় তাদের মুখ লাল হয়ে গিয়েছে, ঠোঁট কামড়িয়ে চেপে রেখেছে — ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কী? কী দেখলে?' অনেক কষ্টে তাদের মুখে কথা ফুটল — 'হুজুর, ছোটদারোগা-সাব তো একদম শো গিয়া!' আর তারা সামলাতে পারল না, হাসিতে একেবারে ফেটে পড়ল।

ছোটদারোগা বেচারা বেজায় মোটা মানুষ, দুপুরের ভোজনটাও হয়েছিল বেশ গুরুতর। তারপর ডুলিতে চেপে দুলতে দুলতে দিব্য আরামে ঘুমিয়ে পড়েছেন — আর তাঁর সেই বিশাল বপুর অনুপাতে ব্যাঘ্রগর্জনে নাসিকাগর্জন ক'রে সকলের প্রাণে চমক লাগিয়ে দিয়েছেন!

যাহোক, সকলের হাসির সঙ্গে তিনিও লজ্জিতভাবে যোগ দিলেন।

* * * * * দেশী-বিদেশী * * * * *

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

বাজিয়েছে রণ-ড্রাম
রডারিক রন্‌ডাম
(শহরের বাসে ট্রামে)
সং ছিল গ্রামে গ্রামে
তাই বুঝি সংগ্রাম ॥

———

কারজন নামে ছিল কম ক'রে চারজন
একজন বড়লাট, তিনজন টারজন ॥

রূপকথা

আছে এক রাজপুত্তুর
সুতরাং যা দস্তুর
থাকবেই তাঁর শত্তুর রাক্ষস।
রাক্ষস হলে হবে কি!
নেই তার সেই সাবেকী
দাঁত নখ কি বিত্তাপ আর নামযশ।

নেইকো নাকী আওয়াজ
শেখে নি কুচ কি' আওয়াজ
হাঁকে না হাঁউ মাঁউ খাঁউ খাঁউ।
নেহাতই গোবর গণেশ
যেমন রূপ তেমনি বেশ
যেন এক থ্যাংরা কাটির
ডগাতে কুমড়ো কি লাউ।

পেটটাও নয়কো জ্বালা;
শুধু তার বড় জ্বালা।
সারাখন ভাবনা শুধু কীখাই কী খাই।
খাবে কী? বাজার আগুন
নেই ভাত জুটলেও নুন;
শেষে সে মনের দুখে
ভাবে যে শহরে যাই।

শহরে কেউ চেনে না।
মেলে না কাজ কি দেনা
কলে জল খেয়ে ঘুমোয় ফুটপাথে।
আমাদের রাজপুত্তুর
আতরে গা ভুর ভুর
সেখানেই দেখল তাকে এক রাতে।

হল না দাঙ্গা লড়াই,
কিংবা মুখের বড়াই,
চেনে না কেউই কারেও হায় রে!
দয়াময় রাজপুত্তুর
আতরে গা ভুর ভুর
কিছু তায় ভিক্ষে দিয়ে যায় রে।

ফুরোল রূপকথা কি?
না কিছু রইল বাকি
ছড়া যা ছাপিয়ে পড়ে উপচে
মিল আর পাই না খুঁজে;
পারে যে নেবে বুঝে
কালি নেই কলম গেছে চুপসে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কত্তাবাবা

মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা বলতুম কত্তাবাবা। কত্তাবাবারা অনেক ভাই ছিলেন, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সবার ছোট। বড়-কত্তাবাবাদের সঙ্গে বিশেষ আমাদের যোগাযোগ ছিল না; দেখেছি তাঁদের অল্পই, কাকে কী ব'লে ডাকতে হবে তাও কেউ আমাদের শিখিয়ে দেন নি। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে আমরা ছেলেবেলায় প্রায়ই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে পেতুম —তাই তিনিই ছিলেন আমাদের কত্তাবাবা।

কত্তাবাবা জোড়াসাঁকো-বাড়িতে সব সময় থাকতেন না। তিনি থাকতেন শান্তিনিকেতনে, কখনও কখনও বিদেশে। কিন্তু যখন দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনের ছ-নম্বর বাড়িতে আসতেন তখন ঠাকুরবাড়ির চেহারাই বদলে যেত। চেহারা বদলে যেত মানে, দরজায় জানলায় রঙিন পর্দা টাঙানো হত বা ঝালর ঝোলানো হত বা ফুল-পাতা দিয়ে বাড়ি সাজানো হত তা তো নয়। বাড়ি যেমনকার তেমনই থাকত। শুধু মনে হত মানুষরা সব যেন আস্তে আস্তে জেগে উঠছে। কিসের একটা ছোঁয়া লেগে যেত চারিদিকে। অন্যরকম মনে হত সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি দিনগুলিকে। ছ-নম্বর বাড়ি থেকে কত্তাবাবা চলে আসতেন আমাদের পাঁচ-নম্বর বাড়িতে আমাদের দাদামশায়দের কাছে। গগনেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, তিন দাদামশায় ছিলেন কত্তাবাবার বিশিষ্টতম সহচর। তাঁরাও যেতেন ছ-নম্বর বাড়িতে। আনাগোনা চলত কেবলই। এই চারজনে এমন জমত যে কী বলব। এঁদেরই ঘিরে এসে পড়তেন জোড়াসাঁকো বাড়িতে কলকাতার জ্ঞানী-গুণীরা, মনীষীরা। অভিনয়ের তোড়জোড় হত, নতুন নতুন গান শোনা হত, নতুন রচনা পাঠ হত, কত কী আশ্চর্য জিনিস সৃষ্টি হত; রঙ্গমঞ্চ রচনায়, অভিনয়-কৌশলে, সাজ-সজ্জায় নতুন নতুন চিন্তা, নতুন সুর, নতুন কথা, নতুন ঢং নিয়ে চলত উৎসাহপূর্ণ পরখ। আর আমাদের ছোটদের যেটা সবচেয়ে আশ্চর্য লাগত সেটা হচ্ছে এই যে, আমরাও অনায়াসে অবলীলাক্রমে বুড়োদের এই সমস্ত ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারতুম; কোথাও একটুও বাধত না। অথচ আমাদের পরিবারের সামাজিক ক্রিয়াকলাপে অন্যান্য বুড়োরা যখন এসে মিলিত হতেন তখন তাঁদের সেই জগতের প্রকৃতি হত একেবারেই অন্যরকম। বিদ্বান বুদ্ধিমান অনেকে সেখানে থাকলেও তাঁদের চোখা চোখা বাক্য-জাল জোড়াসাঁকো বাড়ির ছেলেমেয়েদের কোনদিন আকৃষ্ট করতে পারত না। কত্তাবাবার অদ্ভুত কথা বলবার ধরন ছিল। সবার থেকে স্বতন্ত্র। কেউ অমন ক'রে আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন না। কেমন করে জানি না নিজে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কথা বলিয়ে নিতেন। বড়রা আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন হয় ধমকের সুরে নয় আদরের সুরে। দুটোতেই আমাদের বুঝতে কষ্ট হত না বড়দের সঙ্গে কতটা আমাদের তফাত। কত্তাবাবার কাছে কিন্তু যদি হঠাৎ সাহস করে এগিয়ে যেতুম

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ খুলে যেত আর মুহূর্তের মধ্যে ভুলিয়ে দিতেন বক্তা এবং শ্রোতার মধ্যে বয়সের কোন পার্থক্য আছে কি না। এদিকে কত্তাবাবার সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান ছিল পঞ্চাশ বছরের। কেমন করে এটা ঘটাতেন জানি না, কিন্তু এই জন্যেই বোধহয় আমাদের ছেলেবেলায় তাঁকে একটুও অসাধারণ লাগে নি। আর 'ছুটির পড়া' আর 'কথা ও কাহিনী' পড়ে যতই ভালো লাগুক, যতই মনকে নাড়া দিক — ওগুলো আমাদের চোখে ঘরের জিনিসের মতই ছিল, তাই কোনদিন অসামান্য বলে মনে হয় নি।

নতুন গান, নতুন রচনা, নতুন নাট্য, নতুন অভিনয় — এসব ছাড়াও তখনকার দিনে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ঘটত নানারকম বিচিত্র ঘটনা, তার মধ্যে কিছু কিছু ঘটনা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

হয়তো কলকাতায় এসে পড়েছেন ভারতের বা বিদেশের কোন খ্যাতনামা পুরুষ, তাঁরাও জোড়াসাঁকোর আকর্ষণে পড়ে চলে আসতেন। এইভাবে ইংলণ্ডের বিখ্যাত শিল্পী উইলিয়াম রথেনস্টাইন এসে পড়েছিলেন গগনেন্দ্রনাথের আর অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখতে। তখনকার দিনের বাংলাদেশের সাহেব-গভর্নর দাদামশায়দের বন্ধু এবং দাদামশায়ের ছবির ভক্ত ছিলেন। তিনিই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন রথেনস্টাইনকে। রথেনস্টাইন আসছেন শুনে গগনেন্দ্রনাথ আর অবনীন্দ্রনাথ পাশের বাড়ি থেকে রবীন্দ্রনাথকে ধরে নিয়ে এলেন, সকলে মিলে একসঙ্গে গল্প করা যাবে এই ভেবে। আলাপ হল কত্তাবাবার সঙ্গে রথেনস্টাইনের। খুব আলাপ জমল। রথেনস্টাইন যখন শুনলেন রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের একজন প্রধান কবি, তিনি দুঃখ করে বললেন — আমি তো বাংলা জানি না যে ওঁর লেখা পড়ব? লেখা পড়তে না পারলেও মনের মিল হল দুজনের খুবই। সেই থেকে দুজনে চিঠি লেখালিখিও চলত। সে সময় রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতাই ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয় নি। তখনকার দিনে বাংলা কবিতাই বা পড়ত ক-জন? কত্তাবাবার কবিতার একদল অনুরাগী ভক্ত থাকলেও বহু বিরুদ্ধ সমালোচক ছিলেন যাঁরা বলতেন — রবীন্দ্রনাথ কবিনামের যোগ্যই নন।

রথেনস্টাইন চলে যেতে রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতা নিজেই ইংরেজিতে তর্জমা করতে

করে দেন। এর কিছু দিন পরেই কত্তাবাবার বিলেতে আর আমেরিকায় যাবার কথা ওঠে। গীতাঞ্জলির শ-খানেক কবিতা ইংরেজিতে লেখা হয়ে গেল। সেগুলি নিয়ে কত্তাবাবা বিলেতের পথে বেরিয়ে পড়লেন। লণ্ডনে গিয়ে দুই বন্ধুর দেখা হল অনেকদিন পরে। কত্তাবাবা রথেনস্টাইনকে সেই একশোটি কবিতার একটি খাতা উপহার দিলেন। রথেনস্টাইন পড়ে মুগ্ধ হয়ে তখনকার দিনের ইংলণ্ডের প্রধান কবি ইয়েট্‌স্‌কে দিলেন খাতাটি পড়তে। পড়ে ইয়েট স্‌-এর মনে হল অমন কবিতা তিনি কোনদিন চোখে দেখেন নি। তিনি লণ্ডনবাসী কবি-সাহিত্যিক-সমালোচকদের একটি সভা ডেকে রবীন্দ্রনাথকে কবিতাগুলি পড়ে শোনাতে অনুরোধ করলেন। সেই কবিতা পাঠের ফলে লণ্ডনের সুধীসমাজে যে চাঞ্চল্য হয়, তারই ফলে গীতাঞ্জলির অনুবাদ ছাপা হয়ে বেরল। তারই ফলে ঘটল কত্তাবাবার কপালে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি।

কত্তাবাবা জোড়াসাঁকোর বাড়িতে রয়েছেন, হঠাৎ একদিন শুনলুম গান্ধী আসছেন। সে কী কাণ্ড! ফিস্‌ফাস করে কথা কইতে লাগলেন সবাই। কী গোপন পরামর্শ হবে কত্তাবাবার সঙ্গে গান্ধীর, কেউ জানে না। হয়তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই এবার উলটে যাবে। কলকাতায় সে সময় কংগ্রেসের এক অধিবেশন হচ্ছে। সেই উপলক্ষে এসেছেন মহাত্মা গান্ধী। অসহযোগ আন্দোলন আর বিলিতি জিনিস বর্জন পুরোদমে চলেছে তখন। আমাদের ব'লে দেওয়া হল আমরা যেন গোলমাল না করি, উঁকিঝুঁকি একেবারেই না দিই। কিন্তু অদম্য কৌতূহল আমরা চাপব কী করে? এণ্ডরুজ সাহেবের সঙ্গে যখন মহাত্মা গান্ধী এসে দোতলার ফালি ঘরে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মেঝের উপর আসন নিলেন, তখন সকলের চোখ এড়িয়ে পিছনের বারান্দায় বন্ধ জানলার ফাঁক দিয়ে আমরা কয়েকটি শিশু প্রাণপণে দেখবার এবং শোনবার চেষ্টা করতে লাগলুম ভিতরে কিসের মন্ত্রণা চলেছে। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হল না। দেখলুম চৌকাঠের উপর একটু দূরে ব'সে দাদামশায় অবনীন্দ্রনাথ একটুকরো কাগজে তিনজনের ছবি আঁকছেন। এইটিই দাদামশায়ের আঁকা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ডরুজ-এর বিখ্যাত চিত্র — শান্তিনিকেতনের কলাভবনে রক্ষিত আছে। মহাত্মা গান্ধীর বয়স তখন বেশি হয় নি — মাথায় গান্ধী-টুপি পরতেন। কাউকে খবর না-দিয়েই চুপি-চুপি এসেছিলেন জোড়াসাঁকোতে। প্রথমটা কেউ জানতে পারে নি, কিন্তু হঠাৎ কেমন করে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ভিড় জমে গেল পাঁচ-নম্বর আর ছ-নম্বর বাড়ির মাঝখানের রাস্তা-টুকুতে। ক্রমে মানুষের মাথা বাড়তে বাড়তে আমাদের ফটক পেরিয়ে গেল। শেষে জনতা আর থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল — গান্ধী মহারাজ কি জয়।

গান্ধী তখন ঘর থেকে উঠে এসে পশ্চিমের বারান্দায় হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। গান্ধীর সামনে আমাদের বাড়ির রাস্তার উপর বিলিতি কাপড় পোড়ানো হল। আরো জোরে সমবেত কণ্ঠে গান্ধীর জয়ধ্বনি উঠল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি প্লাবিত হয়ে গেল সেই শব্দে। গান্ধী আবার হাত জোড় করে সকলকে নমস্কার জানালেন, তখন ক্রমে ক্রমে ভিড় পাতলা হয়ে গেল। কিন্তু কত্তাবাবার সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর চার ঘণ্টা ধরে কী যে বিচার-বিতর্ক হল আজ অবধি কেউ তা জানতে পারে নি।

টং লিং

লীলা মজুমদার

॥ উপন্যাস ॥

১

যে জায়গাটাতে আমি এখন বসে আছি এটার নাম পেরিস্তান। এ জায়গার কথা আমি ছাড়া এ বাড়ির কেউ জানেও না, এখানে কেউ আসতেও পারে না। ছোটরা এখানে আসবার রাস্তাই খুঁজে পাবে না আর বড়দের পেট আটকে যাবে। কারণ, এক জায়গায় এ বাড়ির দেয়ালের কোনা আর পাশের গুদোমখানার দেয়ালের কোনা একেবারে ঘেঁষটে গেছে। আর তার নিচে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সরু অন্ধকার একটা নালা।

ভারি ভালো এ জায়গাটা, আঁকড়ে মাকড়ে একবার পৌঁছুতে পারলে আর ভাবনা নেই, কেউ দেখতেও পায় না। সামনে দিয়ে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, আর মাথার বেশ খানিকটা ওপরে ওদের একতলার চাতালে, ঐখানেই ওদের নাটকের রিহারসাল হচ্ছে এখন। ওদের পায়ের তলায় এই চমৎকার জায়গাটার কথা ওরা কেউ জানেও না। জানলে আর অমন নিশ্চিন্ত মনে হাত-পা নেড়ে নাটক করতে হত না!

সবচেয়ে খারাপ ওদের ঐ প্রকাশদা, অহঙ্কারে মাটিতে পা

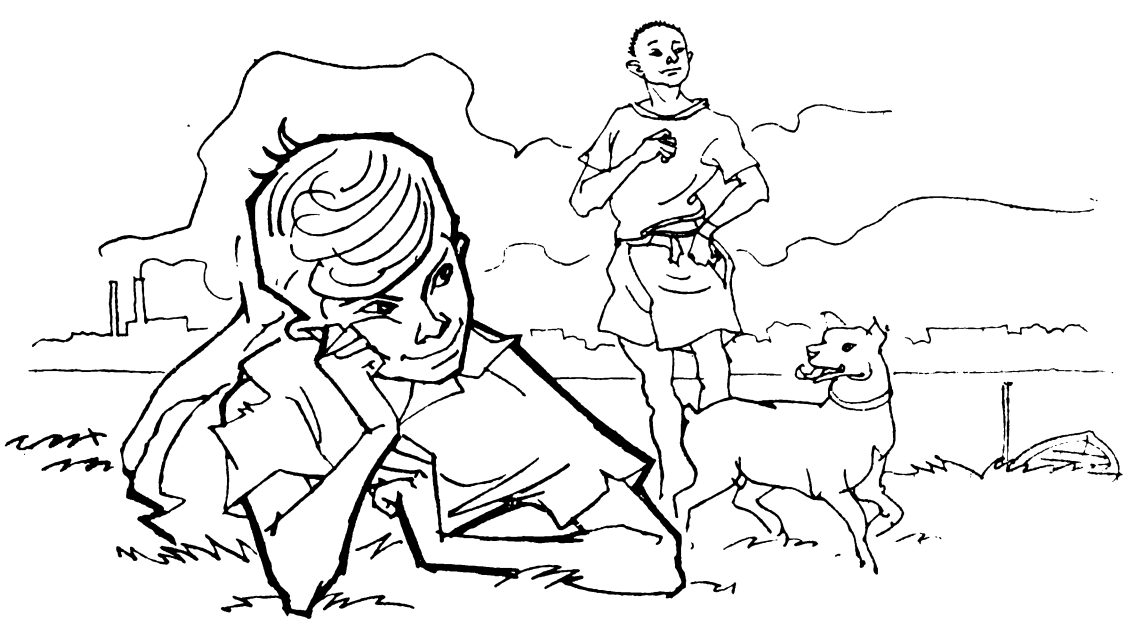

পড়ে না। ওদিকে ক্লাস ইলেভেনে উঠেও বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, নাকি লস্ট হয়েছেন। 'লস্ট' কী তা আমি ঠিক জানি না, তবে আমার বড়কাকিমা যেরকম করে বললেন, মনে হল নিশ্চয় খুব খারাপ কিছু।

ঐ প্রকাশদা সাজছে শিশুপাল, আর ওদের ইস্কুলের অঙ্কের স্যার ব্রজেনদা সাজছে শ্রীকৃষ্ণ। ছোটকাকা শেখাচ্ছেন, — এমনি করে হাত বাড়িয়ে অর্ঘ্যথালা ধরে থাকো ব্রজেন, মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকো। ছোটকাকা যা বলছেন ব্রজেনদা তাই করছে। ওদিকে প্রকাশদাকে পায় কে! বই দেখে দেখে খুব অপমান-টপমান করছে ব্রজেনদাকে। বইতে যেসব কথা নেই সেসবও ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি পেছন থেকে বই দেখে যেমনি সে কথা বলেছি, কী রাগ আমার ওপর! আমার আর কি! এখন যতই অপমান করুক ব্রজেনদাকে, ওর অঙ্কের খাতা দেখবে ঐ ব্রজেনদাই, তখন নাকি একহাত নিয়ে নেবে। আমার বড়কাকার ছেলে বিভুদা বলেছে।

বিভুদাও কম যায় না। আমাকে খালি খালি বলে : ছাখ, আমিই ব'লে ক'য়ে জ্যাঠামশাইকে — জ্যাঠামশাই মানে আমার বাবা — চিঠি লিখিয়ে তোকে আনিয়েছি, এখন আমাদের এক বাক্স দাড়িগোঁফ না দিলে তোকে কিন্তু পার্ট দেওয়া হবে না।

শুনে আমি অবাক! এক বাক্স দাড়িগোঁফ আমি কোথায় পাব? বিভুদা কিছুতেই ছাড়ে না, বলে — পাব মানে? কলকাতার দোকানে সব পাওয়া যায়, গত বছরের ভুতুড়ে নাটকের জন্যে তো কলকাতা থেকেই হাড়গোড় ভাড়া করে আনা হয়েছিল। এ বছর সব ঝগড়াঝাঁটির ব্যাপার, মোটে চাঁদা ওঠে নি, কলকাতা থেকে কিচ্ছু ভাড়া করে আনা যাবে না। ভালো চাস্ তো এক বাক্স দাড়িগোঁফ দে, নইলে ভোঁদার দল আমাদের ওপর একহাত নেবে, এ আমি কিছুতেই সইব না বলে রাখলাম। দাড়িগোঁফ দেব না! ওঃ! ঐ তালপাতার শরীরে তো তেজ কম না!!

এই বলে বিভুদা আমার ডান ঘাড়ে একটা রদ্দা মারল। মেরে বলল, এটাকে আমি মার বলি না, এটা শুধু মারের নমুনা। দাড়িগোঁফ না দিলে আসল মার কাকে বলে টের পাবি, বুঝলি চাঁদ! — বলে আমার গাল টেনে রবারের মত এই এত্তোখানি লম্বা করে দিল! শেষটা আমি এইখানে এই পেরিস্তানে চলে আসতে বাধ্য হলাম।

বিভুদা মনে ভাবে কী? ম্যালেরিয়া হয়ে না-হয় আমার শরীর খারাপই হয়ে গেছে, কিন্তু তাই বলে আমার বন্ধু বিশের তো আর ম্যালেরিয়া হয় নি। আসবে একটু বাদেই বিশে এখানে, হাঙর-মুখো নৌকা বেয়ে ওপার থেকে। কী চালাক বিশে! এখানে পার হলে চাতাল থেকে ওরা দেখে নেবে, তাই গঙ্গার পুলের ওধারে পার হয়ে, নদীর কিনারা ঘেঁষে ঘেঁষে নৌকো চালিয়ে এসে ঐ নালাটির ভেতর নৌকোসুদ্ধু ঢুকে পড়ে। ওখানে দেয়ালের গায়ে এই বড় আংটা লাগানো আছে, তাতে নৌকো বেঁধে বিশে এক লাফে নেমে পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে গলার মধ্যে মেঘ ডাকার মত শব্দ করতে করতে সিংহও লাফিয়ে নামবে।

সিংহ হল আমার বন্ধু বিশের কুকুর। কী চেহারা সিংহের, বাবা! দেখলেই লোকের হাত-পা

হিম হয়ে যায়। আমি কিন্তু সিংহকে একটুও ভয় পাই না। ওর এত বড় কালো থ্যাবড়া নাকের ওপর হাত বুলিয়ে দিই, আর সিংহ ওর বুড়োআঙুলের মতো ল্যাজ নেড়ে, নেচে কুঁদে, আমার মুখ চেটে একাকার করে দেয়।

পোড়া হাঁড়ির মতো এত বড় সিংহের মুখটি, টকটকে লাল জিভ ঝুলিয়ে রাখে। কুকুরের ল্যাজ কেটে দিলে ওদের ভীষণ তেজ বাড়ে, তাই সিংহের ল্যাজটা বিশে বেশি করে কেটে দিয়েছে, তাতে খুব বেশি তেজ হয়েছে ওর।

আমার বন্ধু বিশের গায়ে কী জোর! এই এতখানি বুকের ছাতি, হাতের পায়ের গুলি ইঁটের মতো শক্ত। এতটুকু করে চুল ছাঁটা, তাতে নাকি কুস্তি করতে সুবিধে হয়। হাতাওয়ালা গেঞ্জি আর নীল হাফ-প্যাণ্ট আর শাদা ক্যাম্বিসের জুতো পরে বিশে যখন নৌকো থেকে লাফিয়ে নামে ওকে একটা পালোয়ানের মতো দেখায়। আমি মেজকাকিমার কাছ থেকে চেয়ে আমসত্ত্ব নিয়ে আসি, বিশে এলে ভাগ করে খাই। সিংহও আমসত্ত্ব খায়।

আমরা তিনজনে চাতালের তলায় সবুজ ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে থাকি, আর গঙ্গার পুলের ওপর দিয়ে চেন ঝুলোতে ঝুলোতে মালগাড়ি যায় টং-লিং-টং-লিং-টং-লিং। পায়ের তলায় তখন কী রকম লাগে যেন। মনে হয় অনেক দূরে কোথাও বিশের সঙ্গে চলে যাই।

বিশের বুকে একটা নীল রঙের কঙ্কালের মুণ্ডু আর তার নিচে দুটো মোটা মোটা মানুষের হাড় ক্রশ করে বসানো, এই রকম করে উল্কি দিয়ে আঁকা আছে। দেখে প্রথমটা একটু কী রকম মনে হয়েছিল, ঠিক ভয় না, তবে পেটের ভেতরে প্রজাপতিরা ফড়ফড় করছিল। কিন্তু বিশে বললে,

যাবি নাকি আমার সঙ্গে সমুদ্রের জাহাজে?

শুনে আমি অবাক। বিশে ডাঁসা পেয়ারাতে এক কামড় দিয়ে বললে,

যাবি তো বল। তোকে আন্দামান ছাড়িয়ে আরো অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারি। সেখানে একটা প্রবালের দ্বীপ আছে, তার মাঝখানে মস্ত একটা নীল উপসাগর, সেইখানেই আমাদের আস্তানা। বাইরে থেকে কিচ্ছু বুঝবার জো নেই, পাথরে-আড়াল-করা সরু নালার মতো পথটা দিয়ে একবার ঢুকলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। নারকেলগাছ জড়িয়ে লতা উঠেছে, তাতে থোলো থোলো কালো আঙুর ঝুলছে, পেড়ে খেলেই হল। পাথরের গায়ে কমলামধুর চাক, মধু উপচে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে, সিংহ পর্যন্ত চেটে খায়। মাথার ওপর লাল নীল হীরেমন পাখির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। যাবি তো বল।

যেতে তো খুবই ইচ্ছে করে; কিন্তু মা যে আবার আমাকেই বলেন চিঠি ডাকে দিয়ে আসতে, মুশকিলও আছে ঢের। তার ওপর নিমকি ইস্কুল থেকে ফিরেই বলে, দাদা, আমার ঘুড়ি জুড়ে দাও; বাবা বলেন খবরের কাগজ থেকে এটা-ওটা কেটে রাখতে। বিশের সঙ্গে সমুদ্রের জাহাজে চলে যেতে তো ইচ্ছে করেই কিন্তু তা হলে এসব করবে কে?

পাড়িটা অবধি ভেসে ওঠে। সেই সময়ই বিশে আসে। ভাঁটা পড়লে জল কোথায় নেমে যায়, এক-হাঁটু কাদা বেরিয়ে পড়ে, বিশের নৌকো ডাঙার ওপর বসে থাকে, বিশে আর সিংহ তখন চোরা ঘরে বিশ্রাম করে, আমিও আস্তে আস্তে দেয়াল আঁকড়ে-মাকড়ে উঠে পড়ি। তারপর বাগানের ধার ঘুরে গিয়ে খিড়কি দিয়ে আবার বাড়িতে ঢুকি। ওরা ভাবে বুঝি বাগানের ঘাটে বসে ছিলাম।

ততক্ষণে হয়তো নাটকের রিহারসাল শেষ হয়ে গেছে। বড়রা অনেকেই যে যার বাড়ি চলে গেছে। বিভুদা, ছোটকাকা আরো দু-একজন চাতালের বাঁধানো পাড়ে হাঁড়িমুখ করে বসে ভোঁদার দলের ওপর খুব রাগ দেখাচ্ছেন। আমি আস্তে আস্তে একটা কোনায় এসে বসতেই ছোটকাকা বললেন, অত গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ঘুরে বেড়ালে তো চলবে না চাঁদ! টাকা পয়সার ব্যবস্থা নেই, কারো পার্ট মুখস্থ হয় না, সাজপোশাকের কী হবে তার ঠিক নেই, তার ওপর আজ আবার এই কাণ্ড! অমন চুপ করে থাকলে চলবে না, সবাই মিলে না খাটলে শেষটা ভোঁদার দলই এ-বছর কাপ পাবে নাকি?

আমি বললাম, আমাকে একটা পার্ট দিলে তবে তো করব।

বিভুদা বললে, না না, ছোট্কা, ওকে কিছু বলাটা ঠিক নয়। ও আমাদের সকলের জন্যে দাড়িগোঁফ এনে দেবে।

ছোটকাকা বললেন, দাড়িগোঁফ আর চুল বল।

বিভুদা বললে, ও হ্যাঁ, দাড়িগোঁফ আর চুল।

[ক্রমশ

দেশী-বিদেশী

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

কিংকং বরাবরই বেড়েছিল বহরে
বসবাস ছিল নাকি হংকং শহরে
বীর যদি হতে চাও, তারই নাম লহ রে॥

পাপাঙ্গুল

সত্যজিৎ রায়

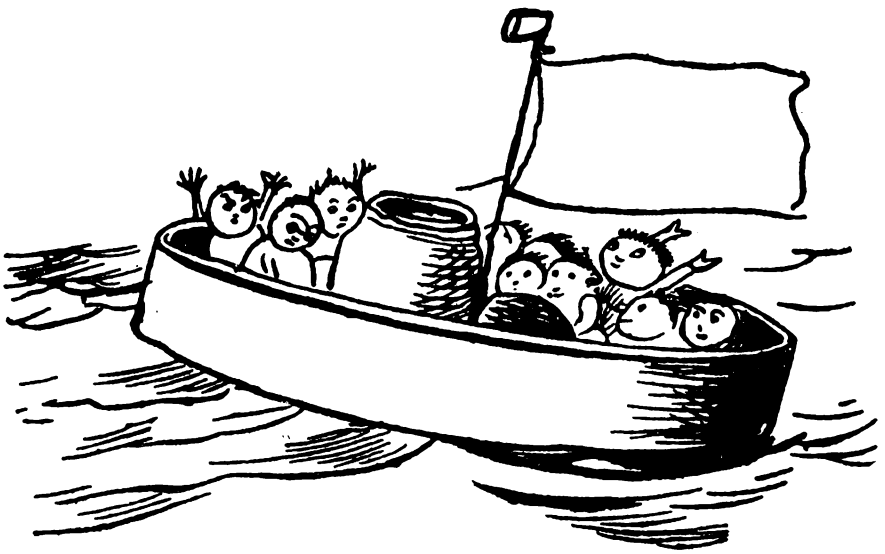

১

তারা ছাঁকনি চড়ে সাগর পাড়ি দেবে
দেবেই দেবে।

তাদের সবাই করে মানা,
বলে, 'আর কিছুতে যা না—
দিচ্ছে হাওয়া পুবে
ঘূর্ণিতে সব মরবি যে রে ডুবে।'
তাও কি তারা টলে?
তারা সবাই মিলে হাত পা ছুঁড়ে বলে—
'মোরা থোড়াই কেয়ার করি,
এই আমাদের মনের মতন তরী,
ছাঁকনি চড়ে সাগর যাওয়ায় নেইকো কোন ভুল।'
এরাই পাপাঙ্গুল।
অনেক দূরে অনেক দেশের পর
এদের আপন ঘর।

নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল—
পাপাঙ্গুল !

২

তারা ছাঁকনি চড়েই গেল
তাতেই গেল।
পুবের হাওয়ায় উঠল ফেঁপে সব্‌জেটে রুমাল
(সেটাই তাদের পাল
তামাক-টানা হুঁকোর সঙ্গে বাঁধা)।
ডাঙার লোকে বললে, 'এমন গাধা,
ওরা বুঝছে না কেউ মোটেই
ডুববে তরী হাওয়ার ঠেলার চোটেই।
এমন জোরে বাওয়া !
বেরিয়ে যাবে ছাঁকনি চেপে সমুদ্রেতে যাওয়া।'
অনেক দূরে অনেক দেশের পর
পাপাঙ্গুলের ঘর।
নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল—
পাপাঙ্গুল !

৩

ঝাঁঝরা দিয়ে জল উঠেছে
জল উঠেছে নায়ে
তাদের ঠাণ্ডা লাগে পায়ে।
তখন বালির কাগজ পালিশ করে পায়ের তলায় সেঁটে
পেরেক দিয়ে এঁটে
বৈয়াম চড়ে রাত কাটাল সবাই,
বললে, 'আমরা ক-ভাই
মোদের পেটে বুদ্ধি রাখি কত,
এই পাড়িতে আসবে বিপদ যত

বলব মোরা—আমরা কি ভুল করি ?'
অনেক দূরে অনেক দেশের পর
পাপাঙ্গুলের ঘর।
নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল—
পাপাঙ্গুল !

৪

রাতটা তাদের কাটল সাগর জলে
সাগর জলেই।
আবার সন্ধ্যা নামে
পাটকিলিয়া পাহাড়খানার বামে।
চাঁদের দিকে চেয়ে
এবার তারা উঠল সবাই আনমুনি গান গেয়ে—
'আহা, অলম্বুশ !
আজকে মোদের মেজাজ বড় খুশ।
আজকে আকাশ চাঁদ-চাঁদোয়া ঢাকা,
ঝাঁঝরা-নায়ে আজ রাতেতে বৈয়াম চড়ে থাকা।'
অনেক দূরে অনেক দেশের পর
পাপাঙ্গুলের ঘর।
নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল—
পাপাঙ্গুল।

৫

পছিম সাগর এলে
ছাঁকনি তবে ডাঙার নাগাল পেলে।
সে এক আজব ঠাঁই,
গাছ ছাড়া আর সেথায় কিচ্ছু নাই।
কার্যপরম্পারা
এই দেশেতেই তাদের খরিদ করা—

একটা প্যাঁচা, একটা গোরুর গাড়ি,
এক পোয়া চাল, পাঁউরুটি এক কাঁড়ি,
শূয়োর, বাঁদর, রঙ-বেরঙা পানি
মৌমাছি আর ঢাকাই বাখরখানি।
অনেক দূরে অনেক দেশের পর
পাপাঙ্গুলের ঘর।
নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল—
পাপাঙ্গুল!

৬

বাইশ বছর পরে
যখন এসে ফিরল তারা ঘরে,
সবাই তাদের দেখতে এসে কয়
'এইটুকুনি মানুষগুলো এত্ত বড়ো কেমন করে হয়?'
'তাও জানো না?' বললে তারা,
'কম ঘুরেছি? সেই কবে দেশছাড়া।
তালুক তুলুক মালুক মুলুক যত
চ্যাংলি পাহাড়, গুম্‌ফি আরো কত;
সব দেখেছি।'
এবার ভোজের পালা,
সবার জন্যে ডাম্‌পুলি এক থালা।
বললে লোকে, 'থাকব যদি ভবেই
ছাঁকনি চড়ে সবায় মোদের সাগর যেতে হবেই।
বেঁচেই যদি থাকি,
চ্যাংলি পাহাড় দেখতে কেন বাকি?'
অনেক দূরে অনেক দেশের পর
পাপাঙ্গুলের ঘর।
নীল মাথাতে সবুজ রঙের চুল—
পাপাঙ্গুল!

(লিয়র-এর কবিতা অবলম্বনে)

দধিসত্ত্ব মুনি

সুনির্মল রায়

দধিসত্ত্ব মুনি নর্মদাতীরে তাঁহার মনোরম কুটিরে বাস করিতেন। শ্বেতপাথরের বেদীতে শাদা কম্বলের আসনে বসিয়া তিনি ধ্যান করিতেন। চুল দাড়ি গোঁফ কামাইয়া মাথায় ঘাড়ে আর মুখে দই মাখিয়া তিনি ধ্যানে বসিতেন। সকালে একটি শ্বেতপাথরের বাটিতে ঘোলের শরবত রাখিয়া তাহাতে একটি শ্বেতপদ্ম ভাসাইয়া দিতেন। দুই-তিন ঘণ্টা পরে ধ্যান হইতে উঠিয়া সেই ঘোল পান করিতেন। আবার দই মাখিয়া ধ্যানে বসিতেন। এইভাবে দিনের ভিতর তিন-চার বার ধ্যান এবং ঘোলপান করিতেন। তিন সপ্তাহ পরে তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। উৎসাহের চোটে তিনি আরও তিন বৎসর এই সাধনা অভ্যাস করিলেন।

তপস্যার প্রভাবে দধিসত্ত্ব মুনির শরীরমন বড়ই স্নিগ্ধ হইল। দিনের বেলায় তাঁহার ঘাম হইত না; রাত্রিতে বড়ই আরামে নিদ্রা হইত। এখন তিনি গ্রামে গ্রামে শিষ্য খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই সাধনার ফল কী?' মুনি বলিলেন, 'এক সপ্তাহে শরীরমন জুড়াইয়া যাইবে, দুই সপ্তাহে অপূর্ব কান্তি হইবে, তিন সপ্তাহে তালুমূলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইবে, মস্তক ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নারাশি বাহির হইবে। তখন নিজেরা তো যারপরনাই আরাম বোধ করিবেই, অন্যেও তোমাদের প্রশংসা করিবে এবং তোমাদের অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিবে। ঘোর গ্রীষ্মেও তোমাদের কষ্ট হইবে না। উন্মাদ, মূর্ছা প্রভৃতি রোগে কখনও ভুগিতে হইবে না, মাথায় রক্ত উঠিবে না। বিশেষত নাসা, ব্যঙ্গ এবং নীলী রোগে কখনও কষ্ট পাইতে হইবে না। লম্বজিহ্বতা, গলগ্রহ এবং হনুমন্যাদির বিকৃতি সারিয়া যাইবে। তখন এমন সুন্দর চেহারা হইবে যে, সিংহব্যাঘ্রও তাহা দেখিয়া হিংসা ভুলিয়া আরামে চক্ষু বুজিয়া ফেলিবে।'

মুনির পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা শুনিয়া এবং সহাস্য বদন ও স্নিগ্ধ কান্তি দেখিয়া ১৫ জন লোক তাঁহার শিষ্য হইল। যাহারা হইল না তাহারাও বলিল, 'ভাবিয়া দেখিব।' শিষ্যেরা চুল দাড়ি গোঁফ কামাইয়া দই মাখিয়া গুরুর সহিত ধ্যানে বসিল। প্রথম দিনই পাঁচজন শিষ্য বলিল, 'মুনি ঠাকুর, আর তো দই মাখিয়া সাধনা করিতে পারি না; মুখের চারিদিকে বড়ই মাছি ভন্‌ভন্ করিতেছে।' মুনি মনে মনে দুঃখিত হইলেও বলিলেন, 'তোমাদের যখন এতই কষ্ট হইতেছে তখন তোমরা যাইতে পার।' সেই পাঁচজন চলিয়া গেল। অবশিষ্ট দশজন শিষ্য উৎসাহের সহিত তপস্যা করিতে লাগিল। এক সপ্তাহ পরে আরও পাঁচজন বলিল, 'গুরো! মাথা যে পচিয়া গেল। দই মাখিয়া মাখিয়া অসহ্য চুলকানি হইয়াছে।' মুনি ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, 'তোমরাও যাইতে পার।' অবশিষ্ট পাঁচজন শিষ্য মুনির উপর নির্ভর করিয়া তপস্যা চালাইতে লাগিল। মুনি তাহাদিগকে বলিলেন, 'বৎসগণ, দ্বিতীয় সপ্তাহ আরম্ভ হইয়াছে, এইবার তোমাদের দিব্য কান্তি লাভ হইবে।'

দ্বিতীয় সপ্তাহ শেষ হইলে শিষ্যদের মধ্যে তিনজন বলিল, 'গুরুজী, ঠাণ্ডা লাগিয়া লাগিয়া আমাদের সর্দি নামিয়া গেল ; আর তো দই মাখা চলে না।' মুনি বলিলেন, 'মাথা ঠাণ্ডা করিবার জন্যই তো এত আয়োজন করিয়াছি, তোমাদের যদি সহ্য না হয় তবে বুঝিতে হইবে তোমরা আমার শিষ্য হইবার যোগ্য হও নাই।'

সেই তিনজন চলিয়া গেল। অবশিষ্ট দুইজন শিষ্যকে মুনি বলিলেন, 'তোমাদের উৎসাহের প্রশংসা করি। আর সাত দিন ধ্যান কর, মহাসিদ্ধি লাভ হইবে, তালুমূলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইবে।' ছয় দিনের পর দুই শিষ্যের একজন বলিল, 'গুরুদেব, তালুমূলে চন্দ্রোদয় হইয়াছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সেই চন্দ্রে গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে ; সুতরাং আমি চলিলাম।'

পরদিন শেষ শিষ্যকে মুনি বলিলেন, 'বৎস, আর এক দিন মাত্র। যে দিনের জন্য আমরা এতকাল অপেক্ষা করিতেছিলাম আজ সেই মহাদিন। চল, আমরা ঐ ধানক্ষেতে বসিয়া ধ্যান করি।' গুরুশিষ্যে ধানক্ষেতে বসিয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ৩.৪ টি বালক লাঠি হাতে সেখানে খেলা করিতে আসিল। তাহারা গুরুশিষ্যের দইমাখা মাথা দেখিয়া বলিল, 'দেখ, কে হাঁড়িতে চুন মাখাইয়া রাখিয়া গিয়াছে। লাঠি দিয়া হাঁড়ি ফাটাইয়া দিলে বেশ হয়।' এই বলিয়া তাহারা গুরু ও শিষ্যের মাথায় লাঠি দিয়া মারিল। শিষ্য লাফ দিয়া পলাইয়া গেল। মুনিও মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে উঠিয়া পড়িলেন। বালকগণ লজ্জায় দূরে সরিয়া গেল। মুনি আর ইহার পর শিষ্য সংগ্রহ করেন নাই।

. . . . . কোথা থেকে এল . . . . . .

'গল্প'

জ্যোতিভূষণ চাকী

কথার পর কথা সাজিয়ে হয় গল্প। কথাগুলোকে আলাদা ক'রে ফেললে আর গল্প থাকে না। কিন্তু প্রত্যেকটা কথার আবার নিজের নিজের গল্প আছে। কেমন ক'রে কথাটা এল, কালে কালে কিভাবে তার মানে বদলে গেল। সেসব খুব মজার গল্প। যেমন ধরো, 'গল্প' কথাটা। সংস্কৃতে 'জল্প' মানে কথা বলা। শুধু কথা বলা নয়, একটু বাড়িয়ে বলা — যা নয় তাই বলা। কল্পনার ভাবটাও তাতে আছে। তাই 'জল্পনা-কল্পনা' একসঙ্গে চলে। কিন্তু গল্পের 'গ' এল কোথা থেকে? মুখে মুখে আগেকার অনেক কথার উচ্চারণ পরে বদলে গেছে। যেমন ছিল 'লবণ', হয়েছে 'নুন'। সংস্কৃতে 'গল্‌ভ' ব'লে একটা কথা আছে। যা থেকে 'প্রগল্‌ভ' হয়েছে। 'গল্‌ভ' মানে একটু বেশি বলা। 'গল্‌ভ' কথাটার ছোঁয়াচ লেগেই হয়তো 'জল্প' থেকে 'গল্প' দাঁড়িয়ে গেছে। কথার পেছনেও যে অনেক কথা থাকে এটা নিশ্চয় এখন ধরতে পারছ?

*

পিকলুর সেই ছোট্টকা

উপন্যাস

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পিকলু তার ঢলঢলে প্যাণ্টটা মশারির ফালিতে বেঁধে নিয়ে গলির প্যাচপেচে ফুটপাথ ধরে খুব সাবধানে চলেছে। বাঁ হাতে কায়দা করে ধরা আছে বেঁটে মোটা একটা বোতল। তাতে চা। ডান হাতটা প্যাণ্টের পকেটে। সেখানে রুটি। ছেঁড়া পকেট বলে ধরে রাখতে হয়েছে।

খাটালের মোষগুলোর কাছে এসে বাঁ পা-টা তার খানিকটা উঠে নেমে এল। একটা প্রায় হাতির মত পেল্লায় মোষ চোখের মণি ঘুরিয়ে ওকেই দেখছে। এবার পা ঠুকলো। তারপর গা ঝাঁকানি দিতেই ভোঁ ভোঁ করে একপাল মাছি উড়তে না উড়তে ফিরে এসে আবার তার গায়েই জেঁকে বসল।

ভাবগতিক সুবিধের লাগছে না তো। পিকলু মারল এক লাফ। দেখতে দেখতে ছিটকে খাটালের গোবর-জলে পড়ে সব একাকার। যাক গে মরুক গে, খাবারগুলো যা হোক করে বাঁচানো গেছে।

অনেকগুলো মোষের তেল-চুকচুকে গা পেরিয়ে তবে পিকলুকে তার ছোট্কা সন্তুর কাছে পৌঁছতে হল।

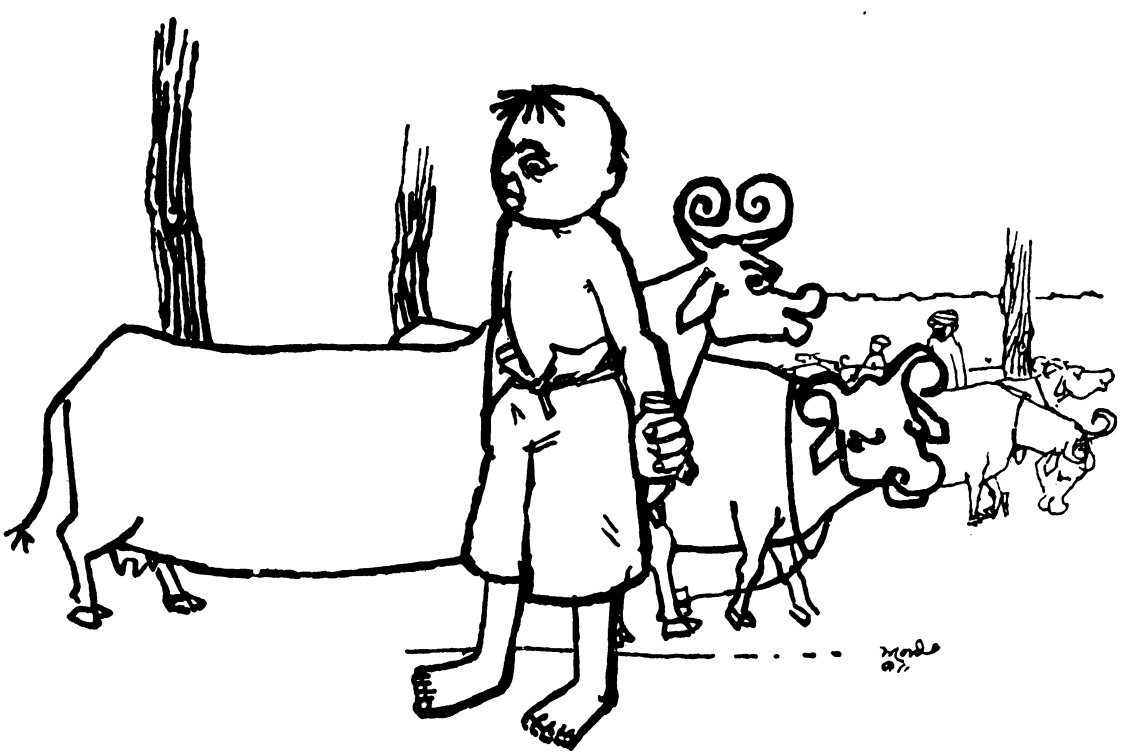

ভাইয়াদের একটা নড়বড়ে খাটিয়ায় শুয়ে কানে হাত ঠেকিয়ে বাসিমুখে ছোট্‌কা কালোয়াতি গান করছে। এতে মোষদেরও অসুবিধে হচ্ছে না আর ভাইয়াদের তো নয়-ই। কিন্তু বাড়িতে হলে? বাপরে—ভাবাই যায় না। এইজন্যেই পিকলু ছোট্‌কাকে এত ভালবাসে। এক দুই তিন চার করে কিছুই মানানো যায় না ছোট্‌কাকে।

চা দেখে ছোট্‌কা এমন তড়বড়িয়ে উঠল যে দড়ির খাটিয়াটা সুদ্ধ কাৎ হয়ে পড়ে চিৎপটাং।

'চা! হা, হা!' বলে ছোট্‌কা মস্ত মস্ত দাঁতগুলো প্রায় সব-কটা বার করে হাসল। রুটিতে চাতে মিলে তার গবাগব খাওয়া দেখলে কে বলবে দেশে দুর্ভিক্ষ নেই!

কয়েক সেকেণ্ডেই খাওয়া-দাওয়া সেরে একটা 'আঃ' শব্দে ঢেঁকুর তুলে ছোট্‌কা বিড়ি ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল—'তুই খেয়েছিস?'

'না।'

'সে কী রে—তোর খাবারটা আমায় দিয়ে দিলি নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'পাঁঠা কোথাকার! বলেছিলাম না চুরি করে আনতে।'

'চুরি করেই তো এনেছি। চা-টা পট থেকে ঢেলে আমার দুধে মিশিয়ে নিয়ে এলাম। বাদবাকি দুধটা পুসি চুরি করে খেয়ে ফেলেছে।'

ছোট্‌কা কোঁচার খুঁট থেকে টিপে টিপে ছটা নয়া পয়সা বার করে খানিকটা কী ভাবল। তারপর জুত করে গিয়ে বসল ভাইয়াদের আড্ডায়।

'এ ভাইয়া—' বলে সুর করে অনেক কথা হল তাদের সঙ্গে। হাতে খইনি টিপতে টিপতে বোঝা গেল ছোট্‌কা মতলব ভাঁজছে।

ছোট্‌কা হঠাৎ কাঁচুমাচু মুখে অন্যদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—'ছাতু খাবি?'

'হুঁ!' ছাতু পিকলু কক্‌খনো খায় নি। ওদের বাড়িতে কেউ জীবনে ছাতু খেয়েছে কিনা সন্দেহ। ছোট্‌কা নিজেও খায় না। না খেয়ে দুদিন পড়ে থাকলেও ছাতু খাবে না। ছোট্‌কার মতে ওদের বংশ হল প্রতিভার বংশ — ছাতু খেলে নাকি বুদ্ধি আর প্রতিভা সবই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

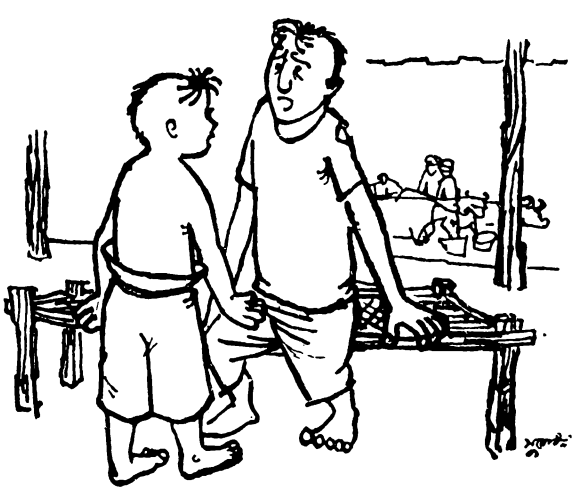

পিকলু তাহলে বংশ-প্রতিভার মধ্যে পড়ছে না তো? বাঁচা গেছে। ওর অবিশ্যি প্রতিভা থাকবার কথাও নয়। ওর বাবা হলেন ওর দাদুর সেজো ছেলে আর ও আবার ওর বাবার সেজো ছেলে। কে যেন বলেছিল সেজো ছেলেরা আসলে ছাগলের তৃতীয় ছানার মত। বড় দুটো দুধ খেয়ে মানুষ হয় আর তৃতীয়টা হয় নেচেকুঁদে।

কথাটা পিকলুর পক্ষে খুবই খাটে। মা মারা যাবার আগে পর্যন্ত অবিশ্যি অন্যরকম ছিল। কিন্তু যেই মা মারা গেলেন অমনি পিকলুকে নিয়ে মারামারি লেগে গেল। জনে জনে সবাই বলতে লাগলেন—আহা রে, বাছা রে,

পিক্‌লু আমার কাছে থাকবে। ওর বড় দু'ভাই বোর্ডিং-এ চলে গিয়ে এই টানাহেঁচড়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেল। কিন্তু পিক্‌লুর মাত্র তখন পাঁচ বছর বয়েস। তাই সকলের এই 'আহা-রে আহা-রে' শুনতে শুনতেই ওর যা-ও বা কথা ফুটেছিল তাও প্রায় বন্ধ হতে বসল।

পিক্‌লু শুনল ছোট্‌কা বলছে —

'ছাতু খেতে বলতাম না রে। কিন্তু ছ নয়া পয়সায় কী-ই বা খাবি পেট ভরে? আর পয়সা নেই। জল্‌দি খেয়ে নে। ও বেলা চট্‌পট্‌ আসিস। আজ একটু বেপাড়ায় ভিক্ষে না করলে আর চলবে না।' বলে ছোট্‌কা খইনি মুখে ফেলে দুবার থু থু করে থুতু ফেলল।

পিক্‌লুর কতদিনের শখ ছাতু খাওয়ার। আঙুলগুলোকে পর্যন্ত চেটেপুটে সাফ করে নিতে নিতে তার মনে হয় — ছাতু না অমৃত! এই সাত বছর বয়েসের মধ্যে সে কখনও এমন জিনিস খায় নি। একটু ঝালঝাল করে মেখে দিয়েছে। লোকটা কিন্তু বেশ। বংশ-প্রতিভা নেই বটে কিন্তু মোষটোষ নিয়ে দিব্বি আছে বলতে হবে।

বাড়ি ফিরে পিক্‌লু দেখল তার খোঁজই হয় নি। কেননা ছোট্‌কার গল্পেই সব মশগুল। পাড়ার থানা থেকে ও-সি এসে গম্ভীর মুখ করে অনেক ধরনের সব কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলছেন। জ্যাঠামণি আরও গম্ভীর মুখে নখ খুঁটছেন। ন কাকামণি আপিস কামাই করে ন'মাকে নিয়ে শ্যামবাজার থেকে ঠেঙিয়ে এসেছেন। মেজজ্যেঠুর গলার স্বরটাই একা সপ্তমে চড়ে কথা বলছে। এ বাড়িতে কিছু হলেই ভীষণ গুল্‌তানি হয়। বড়রা যাকে বলেন পরামর্শ করা।

পিক্‌লু কান পেতে শুনতে লাগল। কাকামণি কী যেন মিনমিন করে বললেন, শোনাই গেল না। তার উত্তরে মেজজ্যেঠুর বাজখাঁই গলা শুনল সে — 'তিনদিনের মধ্যে তাকে খুঁজে বার করতেই হবে। পরশুর পরের দিন ওকে আপিসে হাজির করতে না পারলে চাকরিটা যে যাবে তা-ই নয়, ওর প্রাপ্য টাকাটাও সব মাঠে মারা যাবে।'

ও-সি গলাটাকে খুব খাদে বসিয়ে উত্তর দিলেন — 'যথাসাধ্য চেষ্টা করব। তবে বুঝছেনই তো, এ সমস্ত কেস ভীষণ সিরিয়াস হওয়ায় আমরা আগে তা পুলিশ গেজেটে ছেপে নিই। তাছাড়া, হুঁ, আপনাদের মত ফ্যামিলির সমস্ত কেসই আমরা ভয়ানক ইম্‌পরটেন্স দিয়ে থাকি।' শেষের কথাগুলো তিনি জ্যাঠামণির দিকে তাকিয়ে বললেন। জ্যাঠামণির আসলে খুব নামডাক—বই লেখেন। আর মেজজ্যেঠুর চায়ের ব্যবসা আছে।

পিক্‌লুর মনটা খুবই খারাপ হয়ে গেল। ছোট্‌কাকে কী করে বাঁচাবে সে? এক খাটালের ভাইয়ারা ছাড়া তো দলে তেমন কোনো মানুষ-জনও নেই তাদের। পুলিশ পেছনে লাগলে কি আর রক্ষে আছে! ধরবে আর কালো গাড়িতে পুরবে।

তখন ছোট্‌কার গানই বা কোথায় থাকবে আর প্রতিভারই বা কী হবে।

প্রতিভা জিনিসটা যে কী ভাল বোঝা যায় না। ছোট্‌কা এত এলোপাথাড়ি বকে যে পিক্‌লু সব কথা বুঝে উঠতে পারে না। ছোট্‌কা পালাবার পরই ও জিজ্ঞেস করেছিল—

'কেন পালালে?'

'কেরানী হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে মরা ভাল।'

'কেরানী কাদের বলে?'

'কেরানী? কেরানী দু রকমের হয়। একরকম হল রানী — খবরের কাগজে দেখিস নি? অমুক জায়গার রানী, তমুক জায়গার রানী, তাদের কাজ হল দাঁত বার করে হেসে হেসে রাজাদের রাজত্ব বজায় রাখা। আর

একরকম হল কেরানী, তাদের সব হাড়গিলে ক্যাকলাসের মত চেহারা। কাগজে মিছিল না করলে তাদের ছবি বেরোয় না। সেই কেরানী হলাম আমি আর আমাদের বংশের আরও দু-দুটো ছেলে।'

'ও! তাহলে কেরানীরা সবাই তো ছেলে?'

'হ্যাঁ, মোটামুটি।'

'তাদের বউরা বুঝি রানী নয়?'

'রানী বটে তবে ম্যাথরানী, পরবার কাপড় জোটে না। কী-ই বা খায় আর কী বা পরে? তাইতেই তো বিয়ে করি নি।'

'মা-মণি আর দিদা যেসব রানীর গল্প আমায় বলেছে তারা তো তোমার রানীদের মত বিচ্ছিরি নয়।'

তার এ কথা শুনে ছোট্‌কা হো হো করে হেসে উঠে শানের ওপর গড়াগড়ি দিয়েছিল। এমনিই অদ্ভুত তার ছোট্‌কা।

ছোট্‌কার কথা ভাবতে ভাবতে পিকলু খাবার-ঘরে এসে পড়ল। গোল টেবিলটার চারধারে বাড়ির সব মেয়েরা সাংঘাতিক চড়া গলায় কথা বলছে। এমনিতে নিজেদের মধ্যে ওদের বেশ রেশারেশি। কে কত সাজবে, কার মেয়ে নাচে ভাল, কার চেহারা দেখে কে অবাক হয়ে চেয়েছে এইসব। কিন্তু যেই ছোট্‌কা পালাল অমনি সব ভাব। কথার মধ্যে শুধু ছোট্‌কার নিন্দে আর কে কবে কোন বেয়াড়া ছেলেকে বা লোককে পালাতে দেখেছে তার গল্প। মুখে মুখে কথার ঝড় বইছে। ধুলো ঝড়।

ন মা তখন পিসিমণিকে বলছেন, 'আমার মনে হয় এটা তোমাদের বংশের ধারা ভাই। ওকে দিয়েই হাড়ে হাড়ে বুঝছি। কী খামখেয়ালি মানুষ! তবু চাকরিটা এখনও করছেন। কিন্তু সন্তুর এ কী কাণ্ড ভাই?— এসবের জন্যে বড়দাই দায়ী। কী আহ্লাদ দিয়ে যে ভাইদের মানুষ করেছেন! বড়দির ওপর দিয়ে কি কম ঝক্কি গেছে?'

পিসিমণি মুখের কথা লুফে নিলেন,

'বড় বৌদির কথা ভাবলেও চোখে জল আসে। মরে বেঁচেছে। আমার মত পোড়া কপাল নয় তো দুটো অপোগণ্ড নিয়ে দিনের পর দিন সবাইকে জ্বালিয়ে বেঁচে থাকব। সন্তুকে তো বুকে করে মানুষ করেছে বৌদি কিন্তু মানুষ করতে পেরেছে কি? সবাই মানুষ হয় না ভাই।'

মেজোমা গালে হাত দিয়ে অন্যমনস্ক মুখে এতক্ষণ চেয়ে ছিলেন। এবার হাসলেন — 'ও এখন কার ঘাড়ে আছে তাই ভাবছি। বাড়িতে তো কুটোটি ভেঙে দুখানা করতে পারত না। আর কী নোংরাই করতে পারে ঘরদোর।'

পিসিমণির মেয়ে বড়দি হেসে গড়িয়ে পড়ল —

'ওর কথা আর কত বলব? সেবার জিজ্ঞেস করলাম—ছোটমামা বিয়ে করছ না কেন? কী বলল জানো? বলল কোথায় নাকি বিয়ের ঠিক হয়েছিল। তারপর ও মেয়ের বাড়ি গিয়ে দেখে ধাড়ি-মত মেয়েটা—একে ফ্রক পরে তায় বোকা-বোকা দেখতে। তাতে ও নাকি বলে ফেলেছিল—কী রে বাবা, এই ফ্রক-পরা সঙের সঙ্গে বিয়ে? বলে নাকি একটু সঙের নাচও দেখিয়েছিল। তাইতে বিয়ে ভেঙে যায়।'

হাসির হল্লোড় উঠল। ন মা চোখ থেকে হাসির জল মুছে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি ঘটনা। অনেক আগের ব্যাপার। ও তো বরাবর ঐ রকম কি না—৪২ বছরের খোকা!'

'পিকলু!' হঠাৎ মেজোমা পিকলুকে দেখে ডেকে উঠলেন—'আবার সেই ঢোলা ছেঁড়া প্যাণ্টটা ফালি বেঁধে পরেছ!'

পিকলু চুপ।

'বেল্ট কোথায়? তোমার প্যাণ্টগুলো কোথায়?'

'আলনায়।'

'এসো আমার সঙ্গে।'

পিকলু মেজোমার সঙ্গে ঘরের দিকে এগুতে এগুতে শোনে ন মা বলছেন — 'এ ছেলেও দেখো কালে কী দাঁড়ায়। মুখে কথা নেই, একেবারে মিচকে শয়তান। চোখ দুটো দেখেছ?'

'মা-ও গেল। বাবা থেকে নেই। মানুষ হবে না —।'

খাটালটা পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে? মেজোমার দেওয়া ভাল দর্জি দিয়ে করানো প্যাণ্টটা পরতে পরতে পিকলু হিসেব করতে লাগল — গলির মোড় পেরিয়ে খুব বেপরোয়া ছুট লাগালে হাঁপাতে হাঁপাতে পৌঁছে যেতে দু মিনিট। ও-সির কথা ভেবে পিকলুর হাসি পেতে লাগল— খুব গেজেটে নাম ওঠাও। ওদিকে আসামী নাকের ডগায় বসে খইনি খাচ্ছে।

'পড়েছ?'

'না।'

'বড়দা পড়ায় নি?'

'না।'

'বই আনো তো দেখি।' মেজোমা বইটা হাতে পেয়ে বানান ধরতে লাগলেন—

'বানান কর তো বেল।'

পিকলু একটু ভাবল। তারপর আস্তে আস্তে বলল—'ক আর ল-য় আবার।'

'ও! বানান কর তো কলা।'

'ক-য় আকার ক।'

'চমৎকার!' মেজোমা গুম হয়ে বসে রইলেন একটু। তারপর আপন মনে বিড়বিড় করে বললেন, 'আদিখ্যেতা করা আর ছেলে মানুষ করা এক জিনিস নয়।'

পিকলু কাঁচুমাচু মুখে জিজ্ঞেস করল—'হয় নি?'

'না। তোমার ছোট্‌কা নিজে পড়াবে বলে এতদিন মাস্টার রাখা হয় নি। এবার হবে। ও কী—পড়াত কী তোমায়?'

'স—ব।'

মেজোমার গলাটা ঝাঁঝালো হয়ে উঠল—

'এর মানে সব? এইজন্যেই তো এ বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করে না।'

মেজোমাকে পিকলুর খুব ভালবাসতে ইচ্ছে করে কিন্তু ভয়ে পারে না। মেজোমা মানুষটা কিরকম যে, ঠিক বলা যায় না। যখন পিকলুর মা ওর ছোট্ট বোনটার সঙ্গে একই দিনে মারা গেলেন তখন মেজোমা পিকলুকে নিতে চেয়েছিলেন। মেজোমার ছেলেও নেই, মেয়েও নেই। থাকবার মধ্যে মেজজ্যেঠু আর পুসি বেড়ালটা। পিকলুরও ইচ্ছে ছিল মেজোমার হতে, বিশেষ করে ও যখন তৃতীয় ছানা! মা বেঁচে থাকতে তো পিকলু বুঝতে পারেনি তাকে ভালবাসবার জন্যে এমন কাণ্ড হতে পারে! মেজোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বড়মা, পিসিমণি, ন মা, মা-মণি—এমনকি বড়দি পর্যন্ত যা আরম্ভ করল! বাবা কাকামণি আর জ্যেঠুরাও কম গেলেন না। কেবল ছোট্কা বলল—এ আবার কী!

মেজোমা কয়েকদিন এ খেলা খেলেই একেবারে বোল্ড আউট্! পিকলুর ইচ্ছে ছিল খেলাটা বেশ অনেক দিন ধরে চলে। অনেকদিন চলা তো দূরের কথা সিজনটা চলে গেল বাবা নিরুদ্দেশ হবার সঙ্গে সঙ্গে। বাড়িতে সবাই ওকে আগের মত ভালবাসলেও ফিস্‌ফিস্ করে নিজেদের মধ্যে ওদের কিসব যেন কথা হয়। তার বাবা নিরুদ্দেশ। নিরুদ্দেশ! নীল একটা সমুদ্রে পালতোলা নৌকো করে বাবা নিরুদ্দেশ হয়েছেন বোধ হয়। তবে কি তার বাবা সেই সওদাগর-পুত্তুরের মত? কিন্তু সওদাগর-পুত্তুরের যে একা নিরুদ্দেশ হতে হবে এমন কথা কেউ বলে যায় নি। একটা ছোটমত ছেলেও কি যেতে পারত না তার সঙ্গে?

কিছুদিন পরে খবর পাওয়া গেল। বাবার চিঠি এল বিলেত থেকে। নিরুদ্দেশ নয়। চাকরি পেয়ে নাকি বিলেত গেছেন। আর ফিরবেন না। ছেলেরা? লিখেছেন তাদের বোর্ডিং-এ দিয়ে দাও।

তাই পিকলুর দাদারা বোর্ডিংএ যাবার পর কে পিকলুকে দেখবে ঠিকই হল না। মেজোমা ওকে দেখলে সরে গিয়ে জালনায় বসে ভাবুক মুখে আকাশ দেখতে থাকেন। মেজজ্যেঠুর সঙ্গে ঝগড়া করে অর্ধেক দিন চলে যান বাপের বাড়ি। কী সুন্দর দেখতে মেজোমাকে — ঠিক সেই এক কন্যা রাগ করে বাপের বাড়ি যান-এর মত। মেজোমাকে এখন কেবল ভয় করে তার।

তারপর বড়মা মারা গেলেন। পিকলু দেখল বড়মা মারা যেতে সে আরও তৃতীয় ছানা বনে গেল। সকলেই তাকে ভালবাসে—মা নেই বলে সকলের কী দুঃখু (বাবার কথাটা কেন ফিস্‌ফিস্ করে বলে!) কিন্তু কেউ খেয়ালই করে না সে ঠিকমত খায় কিনা। ছোটকাও করে না কিন্তু ছোটকাকে পিকলুর কেন যে ভাল লাগে! ছোট্কা আর মেজোমার মধ্যে একটা খুব কী যেন লড়াই আছে। দেখা হলেই দুজনের কথা কাটাকাটি। অথচ পিকলুর কিন্তু দুজনকেই ভাল লাগে।

টিক্ টিক্! টিক্ টিক্! ঘড়িটা এগুচ্ছে কিন্তু পিকলু বেরুবার কোনো পথই পাচ্ছে না। সব জায়গায় ভিড়। মেজোমা দিন বুঝে আজ ওর গতি করবেন ঠিক করেছেন। মেজজ্যেঠুকে বলছেন — 'ওর মাস্টারি আমিই করতে পারতাম কিন্তু করব না। মাস্টার একটা ঠিক করতে বলে দাও। আর আজ ম্যাটিনিতে ডিস্‌নির বইটা দেখে আসুক। দেখছ না অবস্থা?'

মেজজ্যেঠু কী বলতে গিয়ে চেপে গিয়ে বললেন — 'বেশ তো!'

পিকলুর মুখ শুকিয়ে একেবারে আম্‌শি! ডিস্‌নি কী রে বাবা! ওদিকে যে পুলিশ গেজেটে ছোট্কার নাম উঠেছে। তাছাড়া বিকেলে কী খাবে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। কথা ছিল ঠাকুরের গামছাটা চুরি করে পিকলু

নিয়ে যাবে। সেটা পরে ছোট্‌কা ভিক্ষে করবে আর পিকলু পরবে একটা ছেঁড়া প্যাণ্ট। মেজোমার কর্তব্যবুদ্ধিটা আর চাগাবার দিন পেল না।

মাথায় মতলবগুলো পরপর সাজাতে সাজাতে পিকলু তার পিসিমণির মেয়ে বড়দি আর জ্যাঠামণির মেয়ে মেজদির সঙ্গে চলেছে ডিস্‌নির ছবি দেখতে। বাসে উঠেই পিকলু আগে দেখে নিল ভিড়টা কেমন। খুব ভিড়। কেটে পড়লে ওরা জানতে জানতে চৌরঙ্গী। টক্ করে লাফিয়ে পড়ল পিকলু। পকেটে পয়সা ছিল। মেজোমার মেজাজটা আজ ঐ নীল আকাশের মত হয়ে গেছে। দুটো আধুলি, ডালমুট আর আইসক্রীম খাওয়ার জন্যে দিয়েছেন ওকে।

খাটালটার কাছে এসে দেখল সব নিঃশব্দ চুপচাপ। ছোট্‌কা নেই। সকালের সেই ভাইয়াটা ঘুম থেকে সবে জেগে উঠে মাথা চুলকোচ্ছে। পিকলু তাড়াহুড়ো করে তাকে বুঝিয়ে দিল—'এই আট আনা পয়সা কাকাকে দেবে। বলবে পুলিশ লেগেছে, যেন না বেরোয়। কাল সকালে আসব।'

'পুলিশ' বলে লোকটা এমন চেঁচিয়ে উঠল যে মনে হল পাড়ায় ডাকাত ধরতে বুঝি পুলিশ বাহিনী এসেছে। পিকলুর দাঁড়াবার সময় ছিল না। ছুটে ফিরে গিয়ে সে একটা বাসে উঠে বসল। এবার সিনেমা হলে পৌঁছে বড়দি, মেজদির জেরার জ্বালায় প্রাণ যাবে। এতক্ষণে ওরা কী গোলমাল লাগিয়েছে কে জানে!

চৌরঙ্গী পৌঁছে দেখে স্টপেই ওরা কাঁদো কাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে। ওকে বাস থেকে নামতে দেখে লাফিয়ে এল দুজন। যেন কিছুই হয় নি এমন ভাবে পিকলু বলল—'ধাক্কা খেয়ে পড়ে গিয়েছিলাম যে। একটা আধুলি হারিয়ে গেছে। এটা ভাঙাই নি। টিকিটই নেয় নি।' বড়দি হেসে উঠল—

'বেঁটে বাঁটকুল তো! যাই হোক বাড়ি গিয়ে এসব বলে কাজ নেই। মেজোমামী শুনলে দেখাবে মজা।'

বাড়ি ফিরে এসে ওরা দেখল হৈ চৈ ব্যাপার। এরই মধ্যে থানা থেকে লোক এসে জানিয়েছে যে ছোট্‌কা নাকি ধরা পড়েছে। আপিস থেকে ফিরেই বড়দা, মেজদা, ছোড়দারা দল বেঁধে গেছে থানায়। মেজজ্যেঠু, জ্যাঠামণিদেরও ফোন করা হয়েছে। ওঁরাও গেছেন। পিকলুর বুকটা দুরদুর করছে খবরটা শুনে পর্যন্ত। মেজোমার যে কী হয়েছে আজ কে জানে। আবার বই নিয়ে ওর পেছনে লেগেছেন। ফলে ঝুড়ি ঝুড়ি ভুলই হচ্ছে কেবল। মেজোমা কি বুঝছেন না পিকলুর মনটা এখন কোথায়?

মেজোমার বোনেরা এসে পড়ায় পিকলু বানান করার হাত থেকে বেঁচে গেল। মেজোমার বোনেদের দিকে তাকালেই পিকলুর ভীষণ হাসি পায়। কেননা ওদের ভুরুগুলো যে আগাগোড়া আঁকা তা ও জানে। একদিন এ বাড়িতে ওরা চান করেছিল। ভুরুও ছিল না ঠোঁটও হয়ে ছিল একেবারে সাদাটে। এখন কিন্তু সারামুখে আঁকা-জোকা। দেখলেই পিকলুর সার্কাসের কথা মনে হয় কেন?

মেজোমার বোনেদের নিয়ে এ বাড়ির সবাই মেজোমার পেছনে হরদম হাসাহাসি করে। বলে 'বেম্মদত্যি!' মেজজ্যেঠুর তো নিজে পছন্দ করে বিয়ে কিনা। সক্কলে জানে। পিসিমণি পেছনে মেজোমাকে বলেন বটে বেম্মজ্ঞানী, কিন্তু সামনে রকমসকম একেবারে অন্য। মেজোমার থুতনি ধরে বলবেন — 'তোমরা হলে ভাই ব্রাহ্মসমাজের মেয়ে — তোমাদের মত লেখাপড়া তো শিখি নি — টেক্কা দেব কী করে?'

এহেন মেজোমার চোখ এড়ান যায় কী করে? বিশেষ করে যখন গোটা চারেক বোন সরুগলায় ইংরিজিতে কথা বলছে? পিকলু চোখ পিট্‌পিট্ করে ইংরিজি কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ কান খাড়া করে উঠল। ওটা কিসের শব্দ! সেই শিস — সেই শিস!

(ক্রমশ)

জেনি মেমসাহেব নয়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জেনি। নাম শুনে ভেবো না মেমসাহেব। আসলে জেনি মানুষই নয়। জেনি ছিল বনমানুষ। ছিল বলছি, তার কারণ সে আজকের কথা নয়। আলিপুর চিড়িয়াখানায় প্রথম ওরাংওটাং আসে ১৮৭৬ সালে। সাহেবরা তখন এদেশের হর্তাকর্তা। কাজেই মেমসাহেবদের নামে তার নাম দেওয়া হল জেনি। চিড়িয়াখানার এক ছোট্ট খাঁচায় জেনিকে রাখার ব্যবস্থা হল। একটা কাঠের চৌকো বাক্স, তাতে খড়ের বিছানা আর গায়ে দেবার পাতলা একটা কম্বল; খাঁচার এককোণে মাটির ঘড়ায় খাবার জল আর একটা টিনের মগ। ব্যস, জেনির ঘরে আসবাব বলতে এই। মগ থাকলে কী হবে, মগে ক'রে জল খেতে জেনিকে খুব কম সময়ই দেখা যেত।

জেনির যখন সবে ছ বছর বয়স, তখনই তাকে দেখাত যেন এক ছিয়াশি বছরের বুড়ো। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছে, সব সময় ভয়-ভয় ভাব। সারা শরীর যেন পুঁটুলি পাকিয়ে আছে ঠাণ্ডায়।

জেনিকে যে দেখাশুনো করত, জেনি ছিল তার ভারি ন্যাওটা। সব সময় তার পায়ে পায়ে ঘুরত। একটু চোখের আড়াল হলেই অমনি জেনি তাকে খুঁজে বেড়াত। জঙ্গলের জীব হলে কী হয়, জেনি ছিল বেজায় ভীতু। ভাল্লুক কিংবা কোন বড় জন্তু একটু নড়াচড়া করেছে কি অমনি জেনি সেখান থেকে দে ছুট।

পরে খাঁচা গিয়ে জেনির জন্যে ভাল ঘর হল। ইঁটের পাকা দেয়াল, তাতে জানলা ফোটানো; মাথায় খড়ের চাল। জেনির যাতে ঠাণ্ডা না লাগে তার জন্যে মেঝেয় উঁচু ক'রে তক্তা বসানো হল। কিন্তু জেনি তখন দারুণ ডানপিটে হয়ে উঠেছে। যখন একা একা ঘরে থাকে টেনে টেনে খড় বার করে। চালে আর কাঁহাতক খড় গুঁজে পারা যায়! কাজেই তখন বাধ্য হয়ে খড়ের চাল বদলে কাঠের ছাদ ক'রে দেওয়া হল। এর পেছনে জেনিরই কোন চাল ছিল কিনা কে জানে?

জেনিকে শীতের সময় খুব সাবধানে রাখতে হত, যেন একটুও না ঠাণ্ডা লাগে। রাত্রে জেনির বুকে গরম সেঁক দিতে হত। সন্ধ্যেয় তাকে খাওয়ানো হত মুরগির সুপ। অবশ্য একটু বড় হয়ে জেনি রাঙা-আলু সেদ্ধ, পাঁউরুটি এসবও খেতে শিখল। অর্থাৎ, বনমানুষ জেনি চিড়িয়াখানায় এসে পুরোপুরি মেমসাহেব ব'নে গেল। ক্ষিধে পেলে রেগে মাটিতে গড়াগড়ি দিত, খেয়ে পেট ঠাণ্ডা হলে জেনি তার এঁটো খাবার যে-তাকে-দেখত তার মুখে জোর ক'রে গুঁজে দিত। ওটা ছিল তার আদর করার ধরন।

মেমসাহেব! তাহলে জেনি বিলেত গেল না কেন? জেনি বিলেত গিয়েছিল বৈকি। শুধু কি সে একা গিয়েছিল — এক দেশী বেড়ালকেও সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়েছিল — তাকে বিলেতফেরত করবার জন্যে। সে গল্প পরে বলছি।

জেনি খায়-দায় ঘুরে বেড়ায়। একদিন এক ছেলে-ওরাংওটাং আলিপুর চিড়িয়াখানায় এসে ভর্তি হল। জেনির সঙ্গে দুদিনে তার দারুণ ভাব হয়ে গেল। দুটিতে সারাদিন টো টো ক'রে ঘুরে

বেড়ায়। কিন্তু হলে হবে কী, ছেলে ওরাংওটাংটা ছিল বেজায় রোগা-পট্‌কা। অত দস্যিপনা তার সহ্য হল না। কিছুদিনের মধ্যেই অসুখে ভুগে সে মরে গেল।

বন্ধুকে হারিয়ে জেনি কিছু-দিন খুব মনমরা হয়ে কাটাল। তারপর এক ভারি মজার ব্যাপার ঘটল।

জেনির দুধে ভাগ বসাতে কোত্থেকে এসে জুটে গিয়েছিল এক দেশী বেড়াল। এই সময় জেনির খুব একা একা লাগছিল ব'লেই বোধহয় হঠাৎ বেড়ালটার ওপর তার খুব মায়া প'ড়ে গেল। দেখতে দেখতে দুজনের গলায় গলায় (না ল্যাজে ল্যাজে?) ভাব হল। বেড়ালটার সঙ্গে জেনির যেমন ভাব তেমনি দিনরাত খুনসুটি লেগে থাকত। সামনের তেঁতুলগাছে উঠত জেনি বেড়ালটার ল্যাজ ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে।

এদিকে ভাল খেয়েদেয়ে জেনির চেহারায় চেকনাই এসে গেল। চুল চকচকে আর গা তকতকে-ঝকঝকে হল। তার আর সেই ভয়-ভয় ভাব নেই। আর সে কুঁকড়ে থাকে না। বিকেলে যখন তার চুল আঁচড়ে দেওয়া হত তখন আরশি হাতে নিয়ে নানারকমের সে মুখভঙ্গি করত। আহা, মরি মরি! কী রূপ! তেমনি স্বভাব। শীত যখন এল, সাহেববাড়ি থেকে তৈরি হয়ে এল তার গরম ফ্ল্যানেলের সুট। দুদিনও গেল না; জেনি সেটাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলল।

বছর দুই পরে খাস বিলেতে তাকে তলব ক'রে নিয়ে গেল লণ্ডন জু।

জেনি কিন্তু বায়না ধরল দেশী বেড়াল-বন্ধুটিকে না নিয়ে সে নড়বে না। পাছে সে ধর্মঘট করে, সেই ভয়ে জেনির সঙ্গে বেড়ালটাকেও লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বেড়ালটা পরে এদেশে ফিরে এসেছিল কিনা জানি না। যদি এসে থাকে তাহলে সেই বোধহয় এদেশের প্রথম বিলেত-ফেরত বেড়াল।

মহাকাশে মানুষ

অমল দাশগুপ্ত

কী সুন্দর এই পৃথিবী!

মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে এই কথাগুলো বলেছিলেন মেজর গাগারিন। পৃথিবীর মানুষ আমরা এমনিতেই এই পৃথিবীকে সুন্দর দেখি। কিন্তু এই পৃথিবীরই একজন মানুষ পৃথিবীর বাইরে থেকে পৃথিবীকে যেন আরো সুন্দর দেখেছেন। কুচকুচে কালো আকাশে তারাগুলো জ্বলজ্বল করছিল, সূর্য যেন জ্বলছিল আরো দশগুণ বেশি তেজে, আর তারই মাঝখানে হাল্‌কা নীল রঙের মস্ত একটা গোলক তাঁর চোখের সামনে নব্বই মিনিটের মধ্যে পুরো একটা পাক খেয়েছিল। পৃথিবীটা যে সত্যি সত্যিই গোল তা এই প্রথম একজন মানুষ পৃথিবীর বাইরে থেকে নিজের চোখে দেখে নিয়েছেন। তিনি খানিকক্ষণ ছিলেন দিনের আলোর দিকে, খানিকক্ষণ রাত্রির অন্ধকারের দিকে। দিনের আলোর দিকে থাকার সময়ে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন মহাদেশের উপকূল-রেখা আর সমুদ্র, বড় বড় নদী আর হ্রদ আর কালো আকাশে ঝকঝকে সূর্য আর তারা। রাত্রির অন্ধকারের দিকে থাকার সময়ে তিনি নিশ্চয়ই শুধু দেখেছিলেন এক-আকাশ-ভরা তারা। এমনকি কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর রাত্রে চাঁদের ফালিটুকু পর্যন্ত তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। তার পরে অন্ধকারের দিক থেকে আলোর দিকে আসার সময়ে তাঁর চোখে পড়েছিল পৃথিবীর দিগন্তরেখা ঝকঝকে কমলা রঙের একটা মালার মতো পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে। আস্তে আস্তে সেই কমলা হয়ে উঠেছিল নীল, সেই নীল হয়ে উঠেছিল কালো। তার পরে আবার সেই কুচকুচে কালো আকাশে নীলাভ পৃথিবী। গাগারিন বলেছেন যে মহাশূন্য থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে এই রঙের খেলা দেখতে দেখতেই তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

এই যে একজন জলজ্যান্ত মানুষ ঠিক একটা উপগ্রহের মতো মহাশূন্য দিয়ে পৃথিবীকে এক পাক ঘুরে এল — ঘুরে আসতে পারল — এই খবরটির জন্যে গত কয়েক বছর ধরেই আমরা মনে মনে তৈরি হচ্ছিলাম। ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর এক-নম্বর স্পুৎনিক আকাশে উঠেছিল — তখন থেকে আমরা যেন ধরেই নিয়েছি যে অসম্ভব বলে আর কিছু নেই। এখন যদি কেউ আমাদের বলতে আসে যে মানুষ আর পাঁচ বছরের মধ্যেই চাঁদে গিয়ে বসবাস শুরু করবে বা আর দশ বছরের মধ্যেই মঙ্গলগ্রহে ও শুক্রগ্রহে — তাহলেও আমরা খুব অবাক হই না।

অথচ একশো বছর আগেও এ-ধরনের চিন্তাকে মনে করা হত নিতান্তই উদ্ভট কল্পনা। আর অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ের পৃষ্ঠা ছাড়া আর কোথাও এদের ঠাঁই হত না। কিন্তু গাগারিনের কৃতিত্বের কাছে জুলে ভার্নে বা এডগার অ্যালান পো বা এইচ-জি-ওয়েল্‌স্‌-এর উদ্ভট কল্পনাও হার মেনে

গিয়েছে। ব্যোমযানের যাত্রী হয়ে সেকেণ্ডে পাঁচ মাইল বেগে মহাশূন্যে পাক খাওয়া—এমনটি যে সত্যি ঘটতে পারে তা চোখের সামনে ঘটতে না দেখা পর্যন্ত কিছুতেই কল্পনা করা যেত না। অবশ্য এ-ধরনের ব্যাপার আগেও ঘটেছে। ১৮৪৮ সালে লেখা একটি বইয়ে এডগার অ্যালান পো একহাজার বছর পরেকার (অর্থাৎ ২৮৪৮ সালের) ছবি এঁকেছিলেন। সেখানে দেখানো হয়েছিল যে একটি বেলুন ঘণ্টায় একশো মাইলবেগে হাওয়ায় গা ভাসিয়ে চলেছে। এডগার অ্যালান পো-র কাছে এই ছিল একটা কল্পনাতীত রকমের প্রচণ্ড বেগ। তিনি নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে আগামী হাজার বছরে মানুষ আর যাই করুক বেগের এই মাপকে কিছুতেই ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু আসলে কী ঘটেছে তা আমরা সবাই জানি। পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই মানুষ এরোপ্লেন আবিষ্কার করেছে আর এরোপ্লেনের বেগ ঘণ্টায় একশো মাইলের চেয়ে অনেক বেশি। আর তারপরেও মাত্র বছর ষাটেক কেটেছে। আর এখন দেখা যাচ্ছে, এই রক্তমাংসের শরীরের মানুষ ব্যোমযানের যাত্রী হয়ে ঘণ্টায় আঠারো হাজার মাইল ছুট দিতে পারে!

গাগারিন
মহাকাশ থেকে নেমে আসবার পর

মেজর গাগারিন যে ব্যোমযানে চেপে মহাকাশে পাড়ি দিয়েছেন তা আসলে একটি রকেট। মানুষ যে কোনো কালে রকেটে চেপে মহাশূন্যের যাত্রী হবে তা কিছুকাল আগেও অসম্ভব বলে মনে করা হত। এক-শো বছরেরও কিছু আগে ইংরেজ বিজ্ঞানী জর্জ স্টিফেনশন প্রথম রেলগাড়ি চালিয়েছিলেন। তাঁর কী খেয়াল হয়েছিল, ইঞ্জিনের নাম দিয়েছিলেন রকেট। ঘোড়ার গাড়ির চেয়েও দ্বিগুণ বেগে এই রকেট ছুটবে শুনে সে-সময়ে ইংলণ্ডে প্রচণ্ড শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। একটি বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকায়

লেখা হয়েছিল—'এই যন্ত্রের কাছে জীবন সঁপে দেওয়া আর রকেটে চেপে শূন্যে পাড়ি দেওয়া—দুয়ের মধ্যে কোনো তফাত নেই। দুই-ই হবে সমান বোকামি।' একশো বছর পরে এখন আর আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না আসল বোকা কে।

আসলে সময়টাই এমন যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়াটাই বোকামি। যে যাই বলুক না কেন তার চেয়েও অনেক চমকপ্রদ কিছু ঘটে যাচ্ছে। এই ১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে যে ঘটনা ঘটল তাও আসলে আরো মস্ত সব ঘটনার শুরু মাত্র। সেই ঘটনাগুলো যখন ঘটবে তখন আজকের এই ঘটনাও খুবই ছোট হয়ে যাবে আমাদের কাছে। আজকের বিজ্ঞান মানুষকে অবাক হবার সময়টুকুও দিতে চায় না। মেজর গাগারিনের দু-বছরের যে মেয়েটির ছবি কাগজে বেরিয়েছে সে টেলিভিশনের পর্দায় বাবার ছবি দেখেই অবাক। কিন্তু এই মেয়েটিই যখন বড় হবে আর স্কুলের ছুটির সময়ে চাঁদের দেশে যাবে পিকনিক করতে—

কিন্তু না, এত কথা বলার পরে আমিই বা আগে থেকে বোকার মতো কেন বলতে যাচ্ছি, এই মেয়েটি ছুটির দিনে কী করবে। আমি নিশ্চয়ই জানি, আমি যাই-ই বলি না কেন তার চেয়েও অনেক অনেক চমকপ্রদ কিছু ঘটবে।

'পুরনো-সন্দেশে'র গ্রাহকদের চিঠি

'সন্দেশ' বার হবে —এ খবর প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাছে চিঠির পর চিঠি আসছে। ছোটরা শুধু নয়, বড়োরাও আমাদের উৎসাহ দিয়ে রোজই চিঠি লিখছেন। যেমন, বিহারের শোনপুর থেকে প্রবোধকুমার ভট্টাচার্য লিখেছেন :

'...প্রায় ৩০ বছর আগে ছাত্রাবস্থায় আমিও একদিন সন্দেশ-এর গ্রাহক ছিলাম। এবং আমার গ্রাহক নং ২ ছিল তাহা আজও মনে আছে। ...আজ সন্দেশ-এর পুনরাবির্ভাবের সংবাদ পাইয়া আমার এক পুত্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। তার মনের ভাব...

সন্দেশ! সন্দেশ!! মন খুশী খবরে
ছিলি কোথা এতদিন? বল কোন কবরে
বাবা-কাকা-জ্যাঠামণি মুখে তোর গুণগান
শুনে শুনে মনটাই করেছে রে আনচান।...
সন্দেশ ভালবাসে ছেলেবুড়ো সব্বাই
পথ তোর চেয়ে চেয়ে দিন গণি শুধু তাই;
তোর ছবি, তোর ভাষা, তোর গালগল্প
সুধারসে ভরি দিক এই সংকল্প।
তাঁর কাছে জোড় হাতে এই শুধু কামনা
ফিরে যদি এলে তবে আর চলে যেও না।'

নয়া-দিল্লী থেকে মহিমারঞ্জন ভট্টাচার্য লিখছেন :

'...৪০ বৎসর আগে আমি সন্দেশ-এর গ্রাহক ছিলাম। ...সন্দেশ এক সময়ে আমাদের সাথী ছিল। আগেকার দিনের সেই সন্দেশ পেলে এই বয়সেও আবার ছোট হয়ে যেতে পারি। আশা করি, সন্দেশ দীর্ঘায়ু লাভ করবে।'

অভিনন্দন জানিয়ে আরও অনেকে চিঠি লিখেছেন। এইসব চিঠি থেকে আমরা কী যে উৎসাহ পেয়েছি তা বলবার নয়। সবাইকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মজার খেলা

নলিনী দাশ

সাধারণত ছুটির দিনগুলো খুব তাড়াতাড়ি কেটে যায়। কিন্তু এই রবিবারটা কিছুতেই কাটতে চাইছে না। প্রথমত মা-বাবা বিশেষ কাজে শ্যামবাজার গেছেন, ছেলেমেয়েদের কাউকে সঙ্গে নেননি। তার উপরে এমন বিশ্রী, পচা, প্যাচপ্যাচে দিন করেছে যে কোথাও বেড়াতে যাওয়া দূরের কথা, সামনের পার্কে একটু ঘুরে আসবারও উপায় নেই, এমনকি কেউ যে বেড়াতে আসবে তারও সম্ভাবনা নেই।

ছোট খুকু আর খোকা — রুনু বেণু — বাবা-মার সঙ্গে যাবার জন্য বায়না ধরেছিল। অনেক কষ্টে তাদের ভুলিয়ে রেখে যাওয়া হয়েছে, কিন্তু তখন থেকেই তাদের মেজাজ খারাপ হয়ে রয়েছে। বেণু কেবল ঝগড়াঝাঁটি করছে আর রুনু বারবার কান্নাকাটি জুড়ছে।

মাসতুতো ভাইবোন বাবলু-টুবলু কিছুদিন ধরে তাদের বাড়িতে রয়েছে ব'লে সাধারণত ভানু আর লীনার খুব খেলা জমে, কারণ তারা চারজনে প্রায় সমানবয়সী। এই রবিবার কিন্তু তাদের কোনও খেলাই ভাল লাগছে না, তারা কেবল চেঁচামেচি তর্কাতর্কি করছে, বেণুকে রাগাচ্ছে নয়তো রুনুকে কাঁদাচ্ছে।

বড় ভাই কানুর অবস্থা শোচনীয়, স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হবার পর থেকে কোন কিছুতেই মন বসানো তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়েছে।

সকলের বড় দিদি বীণা স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে গত বছরই কলেজে পা দিয়েছে, সুতরাং সে তার দায়িত্ব বড় বেশি করে অনুভব করছে। আজ কিন্তু সে তার দিদিগিরি বজায় রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। রুনু নাকে কাঁদছে — 'ওঁ দিঁদি দেঁখো ঐ বেঁণু গুঁণ্ডাটা আঁমায় মেঁরেই ফেঁলছে — আঁমি মাকে বঁলে দেঁব —হুঁ!'

বেণু শক্ত হয়ে পাল্টা নালিশ চালাচ্ছে —'কেন? ও কেন ছোট হয়েও আমার পিছনে লাগতে আসে আগে? আমার কি আত্মরক্ষারও অধিকার নেই?'

বীণা বলল, 'এই রুনু-বেণু, চুপ কর্ — এদিকে আয় — কানু-ভানু-লীনা-বাবলু-টুবলু, গোলমাল থামা — একটা মজা হবে —'

নিমেষে রুনু তার নালিশ আর কান্না ভুলে গেল —'কী হবে দিদি? কী মজা হবে? ম্যাজিক হবে?'

বিজ্ঞের মত বেণু মন্তব্য করল, 'দূর বোকা — দিদি কি ম্যাজিক জানে? দিদি গল্প বলবে — রাক্ষসের গল্প — যুদ্ধের গল্প —'

'যুদ্ধের গল্প ছাই — রাজপুত্তুরের গল্প বল' — গাল ফোলাল রুনু।

বাবলু-টুবলু-ভানু-লীনা কলরব করে উঠল —'না না, গল্প নয়, গল্প নয়, খেলা হবে, দিদি একটি মজার খেলা শেখাও।'

মুরুব্বিয়ানার চালে কানু বলল, 'এত সব কাচ্চা-বাচ্চা চ্যাং-ব্যাং নিয়ে কি খেলা চলে? কী খেলবে শুনি?'

'তার চেয়ে বাচ্চাদের বাদ দাও'— বলল লীনা।

খুকু আবার কাঁদবার উপক্রম করল —'মাকে বলে দেব — হুঁ।'

বেণু বলল —'আমাদের বাদ দিলে খেলা ভেঙে দেব।'

বীণা বেগতিক দেখে রুনুকে কোলে তুলে নিল — বলল, 'কাউকে বাদ পড়তে হবে না, সবাই খেলবে। আগে দুটো দল ঠিক হোক, তারপর খেলা বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

কানু বলল, 'ঠিক আছে, তুমি খুকুকে নিয়েছ, লীনা আর টুবলুকে নাও। আমি বেণু-ভানু বাবলুকে দলে নেব।'

বেণু উৎসাহিত হয়ে উঠল, 'ছেলেদের দল আর মেয়েদের দল? এবারে কী হবে? মারামারি হবে বুঝি? আমরা মেয়েদের একদম হারিয়ে দেব।'

'ইস্ — তা আর পারতে হয় না' — লীনা শক্ত করে নিজের চুলের ঝুঁটি বেঁধে নিল।

'মারামারি নয়'— ব্যস্ত হয়ে উঠল বীণা —'একটি মজার খেলা হবে। এ খেলার নাম মানুষ-বন্দুক-শেয়াল।'

'সে আবার কী?'

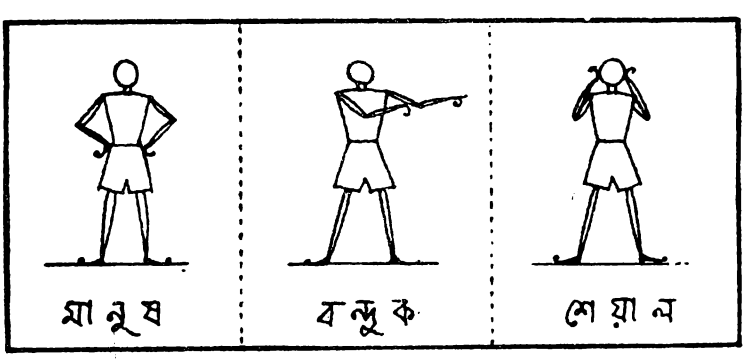

'শোনই না। দুই কোমরে দুই হাত রাখলে হল মানুষ, সামনে হাত সোজা ক'রে বন্দুক ছোঁড়ার ভঙ্গি করলে বন্দুক। আর কানের মতন ক'রে মাথার দুপাশে দুই হাত রাখলে হল শেয়াল। এই দেখ কী রকম।'

বীণার দেখাদেখি ছেলেমেয়েরা মানুষ, বন্দুক আর শেয়াল হওয়া অভ্যাস করে নিল।

'এবার কী হবে দিদি? মানুষটি বন্দুক দিয়ে দুম ক'রে শেয়াল মেরে ফেলবে বুঝি?' জিজ্ঞাসা করল বেণু।

'না-না — শোন শোন —আমাদের তো দুটো দল হয়েছে —তারা পরস্পরের থেকে দূরে সরে গিয়ে চুপিচুপি আগে ঠিক করে নেবে কোন্ দল মানুষ, বন্দুক বা শেয়াল কোন্‌টি হবে। তারপরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ১-২-৩ বলবামাত্র তারা সেই জিনিসের চিহ্ন দেখাবে।'

'তারপর কী হবে?'

'এবার খেলার নিয়ম শোন। শেয়ালের চেয়ে বন্দুক বড় — কারণ, বন্দুক ছুঁড়ে শেয়াল মারা যায়; বন্দুকের চেয়ে মানুষ বড় — কারণ, মানুষ বন্দুক ছুঁড়তে পারে; কিন্তু মানুষের চেয়ে শেয়াল বড় — কারণ, এক দেশের লোকেরা শেয়ালকে পুজো করে। যারা বড় জিনিসটি নেবে, তাদের একটি নম্বর হবে।'

'আর যদি দুজনেই এক জিনিস নেয়?'

'তাহলে সেই দানটি ভেস্তে যাবে। আচ্ছা — এবার খেলা শুরু হোক। আয় রুনু, লীনা, টুবলু — আমরা এই কোনায় ব'সে নাম ঠিক করি —'

বীণা ফিসফিস করে যেই দলের সকলকে শেয়াল হতে বলেছে, অমনি রুনু চেঁচিয়ে উঠেছে — 'কাউকে বলব না — আমরা কিন্তু শেয়াল — এই বেণু, তোরা শুনিসনে —'

সবাই হেসে উঠল।

লীনা রেগে বলল, 'আগেই বলেছিলাম যে খুকুটাকে বাদ দাও — নয়তো সব পণ্ড করবে —'

'না, না, পণ্ড করবে কেন — ঠিক খেলবে খুকু।'

বীণা খুকুকে কানে কানে খুব ভাল ক'রে খেলার নিয়ম বুঝিয়ে দিল। এবার খুকু মুচকি হেসে ঘাড় নেড়ে চুপ ক'রে রইল।

'আচ্ছা, এবার এসো — দু দল মুখোমুখি — ১-২-৩—'

ছেলেরা দেখাল বন্দুক আর মেয়েরা মানুষ।

'মানুষ বন্দুকের চেয়ে বড়। আমরা — জিতেছি — হুর্‌রে' সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল টুবলু আর লীনা।

গাল ফুলিয়ে বেণু বলল, 'ছাই জিতেছ, গুড়ুম করে বন্দুক ছুঁড়ে দিলে তো মানুষেরও দফা রফা —'

'আবার হোক, দেখা যাক, কে জেতে কে হারে —'

মেয়েরা এবারেও মানুষ নিয়েছিল কিন্তু ছেলেরা শেয়াল নেওয়াতে এবার ছেলেরা জিতল।

তৃতীয় দানে দু দলই বন্দুক দেখাল, দানটি ভেস্তে গেল। কয়েক দান খুব হৈ চৈ ক'রে খেলা হল।

তারপরে দেখা গেল রুনু আর বেণু গুটি-গুটি গিয়ে ঘরের কোনায় পুতুল আর 'সোলজার' সাজিয়ে বসেছে।

নতুন ধাঁধা

১। বন্দরে থাকি আমি, পাবে না নগরে ;
পাবে মোরে পর্বতে, খুঁজো না সাগরে ;
দিবসে দেখিবে মোরে, পাবে না নিশীথে ;
বসন্ত কালেতে পাবে, পাবে না কো শীতে ;
রবিবারে থাকি আমি, শনি সোমে নাই ;
বলো তো কি নাম মোর, হে পাঠক ভাই ?

২। প্রত্যেক দুটি পঙ্‌ক্তির শেষে একই কথা বসাতে হবে :—
উদাহরণ—

হারুবাবু দেশে নাই, গেছেন জাপান
মাসে মাসে টাকাকড়ি পাঠান যা পান।
বড় ছেলে তাঁর ভুলু নামেতে ...,
নাই কো খেয়াল, থাকে কোথায় ...।
মেজো ছেলে নাম লালু, বেজায় ...,
মা বলেন লোকজন লালুই ...।
ছোট খোকা নেচে নেচে বেড়ায় ...।
সারা দিন মেতে থাকে হাসিতে ...।
বড় বাড়ি, মেলা লোক, অনেক ...।
সদা শুনি হাঁক ডাক "রুটি দে" " ...। "

ধাঁধার উত্তর ২০শে মে-র মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো চাই।
উত্তর দেবার সময় গ্রাহক-নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

Regd. No. SANDESH Price .075 n.P

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৩ লেক টেম্পল রোড, কলিকাতা-২৯ থেকে প্রকাশিত
ও এভারেস্ট প্রিণ্টার্স, ৩ নবীন কুণ্ডু লেন, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।